INDIAN HERITAGE AND CULTURE

Foundation Course

Second Semester

Group B

[BENGALI EDITION]

Directorate of Distance Education

TRIPURA UNIVERSITY

Reviewer

Prof Palash Mondal
DDE - RBU - History

Author: Professor Sanyasi Samanta, Guest Faculty, Ramananda College

Copyright © Reserved, 2016

Books are developed, printed and published on behalf of **Directorate of Distance Education, Tripura University** by Vikas Publishing House Pvt. Ltd.

All rights reserved. No part of this publication which is material, protected by this copyright notice may not be reproduced or transmitted or utilized or stored in any form of by any means now known or hereinafter invented, electronic, digital or mechanical, including photocopying, scanning, recording or by any information storage or retrieval system, without prior written permission from the DDE, Tripura University & Publisher.

Information contained in this book has been published by VIKAS® Publishing House Pvt. Ltd. and has been obtained by its Authors from sources believed to be reliable and are correct to the best of their knowledge. However, the Publisher and its Authors shall in no event be liable for any errors, omissions or damages arising out of use of this information and specifically disclaim any implied warranties or merchantability or fitness for any particular use.

VIKAS®

Vikas® is the registered trademark of Vikas® Publishing House Pvt. Ltd.

VIKAS® PUBLISHING HOUSE PVT. LTD.
E-28, Sector-8, Noida - 201301 (UP)
Phone: 0120-4078900 • Fax: 0120-4078999
Regd. Office: 7361, Ravindra Mansion, Ram Nagar, New Delhi – 110 055
• Website: www.vikaspublishing.com • Email: helpline@vikaspublishing.com

সিলেবাস বই-ম্যাপিং টেবিল

সিলেবাস বই ম্যাপিং

.পর্যায় ১.১ সিন্ধু সভ্যতা ও বৈদিক সভ্যতার তুলনামূলক আলোচনা (পৃষ্ঠা ১-৮)

সূচনা, দুটি সভ্যতার উল্লেখ, তুলনামূলক আলোচনা: সাদৃশ্য ও বৈসাদৃশ্য

পর্যায় ১.২. ভারতীয় শিল্প ও স্থাপত্যে মৌর্য, শুঙ্গ, পল্লব, চোল এবং মুঘল (পৃষ্ঠা ৯-১৯)

মৌর্যযুগের শিল্প ও স্থাপত্য, শুঙ্গ শিল্প ও স্থাপত্য, পল্লব যুগের শিল্প ও স্থাপত্য, চোলযুগের শিল্প ও স্থাপত্য, মুঘল যুগে শিল্প ও স্থাপত্য।

পর্যায় ১.৩. পঞ্চদশ থেকে অষ্টাদশ শতকে ভারতীয় সাহিত্য বিশেষত সংস্কৃত, সঙ্গম এবং বাংলা সাহিত্য (পৃষ্ঠা ২১-৩১)

সংস্কৃত সাহিত্য, সঙ্গম সাহিত্য, বাংলা সাহিত্য।

১.৪. প্রাচীন ভারতে নারী বা আদিপর্বে ভারতীয় মহিলা : (পৃষ্ঠা ৩৩-৪২)

তথ্যসূত্র ও আইনের দৃষ্টিতে নারী, উপসংহার, গণিকাদের কথা (ভূমিকা),
গণিকাদের রাষ্ট্রীয় স্বীকৃতি ও বিভিন্ন ধরনের বারাঙ্গনা, বিধবাদের প্রসঙ্গে দু'চার কথা (সূচনা),
তথ্যসূত্র ও স্মারকে বিধবাদের চিত্র

পর্যায় ২.১. জৈন ও বৌদ্ধ ধর্ম (পৃষ্ঠা ৪৩-৫৩)

প্রতিবাদী ধর্মের উদ্ভব, জৈন ধর্ম, বৌদ্ধ ধর্ম, উভয় ধর্মের সাদৃশ্য।

পর্যায় ২.২. সুফিবাদ ও ভক্তি আন্দোলন (পৃষ্ঠা ৫৫-৬৪)

সুফি আন্দোলন, ভক্তি আন্দোলন,।

পর্যায় ২.৩. সমাজ-সংস্কৃতির সংস্কার আন্দোলনে রাজা রামমোহন রায়, বিদ্যাসাগর, দয়ানন্দ সরস্বতী, জ্যোতিবা ফুলে এবং আম্বেদ কর (পৃষ্ঠা ৬৫-৭৬)

রাজা রামমোহন রায় (১৭৭২-১৮৩৩ খ্রিষ্টাব্দ), ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর (১৮২০-১৮৯১ খ্রিষ্টাব্দ),
দয়ানন্দ সরস্বতী (১৮২৪-১৮৮৩ খ্রিষ্টাব্দ), জ্যোতিবা ফুলে (১৮২৭-১৮৯০ খ্রিষ্টাব্দ),
বি.আর. আম্বেদকর (১৮৯১-১৯৫৬ খ্রিষ্টাব্দ)।

পর্যায় ২.৪. গান্ধি ও জাতীয়তাবাদী আন্দোলন (পৃষ্ঠা ৭৭-৮৯)

সত্যাগ্রহ, দক্ষিণ আফ্রিকায় গান্ধিজি, তৎকালীন ভারতবর্ষের পরিস্থিতি, গান্ধিজির ভারতীয় রাজনীতিতে যোগদান
আঞ্চলিক সত্যাগ্রহ : চম্পারণ, আমেদাবাদ ও খেদা আঞ্চলিক ক্ষেত্রগুলির, মূল্যায়ন,

রাওলাট সত্যাগ্রহ ও পাঞ্জাব সন্ত্রাস, খিলাফৎ আন্দোলন, অসহযোগ আন্দোলন
আইন অমান্য আন্দোলন, গোলটেবিল ও গান্ধি-আরউইন চুক্তি।

সূচীপত্র

.পর্যায় ১.১ সিন্ধু সভ্যতা ও বৈদিক সভ্যতার তুলনামূলক আলোচনা ঃ (পৃষ্ঠা ১-৮)

১.১.১. সূচনা

১.১.২. দুটি সভ্যতার উল্লেখ

১.১.৩. তুলনামূলক আলোচনা: সাদৃশ্য ও বৈসাদৃশ্য

পর্যায় ১.২. ভারতীয় শিল্প ও স্থাপত্যে মৌর্য, শুঙ্গ, পল্লব, চোল এবং মুঘল (পৃষ্ঠা ৯-১৯)

একক ১.২.১. মৌর্যযুগের শিল্প ও স্থাপত্য

- সূচনা
- ঐতিহাসিকের দৃষ্টিতে বা তথ্যের আলোকে মৌর্য শিল্প ও স্থাপত্য
- শিল্প ও স্থাপত্য

একক ১.২.২. শুঙ্গ শিল্প ও স্থাপত্য

- সূচনা
- হিন্দুধর্মের উৎকর্ষতা
- শিল্প-স্থাপত্য ও দৃশ্যকলা
- প্রগতির ধারায় শিল্প-স্থাপত্যের উৎকর্ষতা
- নিজস্বতা
- বৈশিষ্ট্য

একক ১.২.৩. পল্লব যুগের শিল্প ও স্থাপত্য

- সূচনা
- শিল্প ও স্থাপত্য
- নতুন শৈলী
- উপসংহার

টিপ্পনী

টিপ্পনী

একক ১.২.৪. চোলযুগের শিল্প ও স্থাপত্য

- সূচনা
- শিল্প ও স্থাপত্য
- ভাস্কর্য
- চোল মন্দির

একক ১.২.৫. মুঘল যুগে শিল্প ও স্থাপত্য

- সূচনা
- বিবর্তনের ধারা
- মুঘলযুগে শিল্প ও স্থাপত্য
- উপসংহার

পর্যায় ১.৩. পঞ্চদশ থেকে অষ্টাদশ শতকে ভারতীয় সাহিত্য বিশেষত সংস্কৃত, সঙ্গম এবং বাংলা সাহিত্য (পৃষ্ঠা ২১-৩১)

একক ১.৩.০. পটভূমি

একক ১.৩.১. সংস্কৃত সাহিত্য

- সূচনা
- বেদ
- রামায়ণ ও মহাভারত
- জৈন, বৌদ্ধ ও অন্যান্য সাহিত্য
- পরবর্তী সংস্কৃত সাহিত্য
- আধুনিক সংস্কৃত সাহিত্য

একক ১.৩.২. সঙ্গম সাহিত্য

- সূচনা
- সঙ্গম সাহিত্যের পরিধি
- শ্রেণীবিভাগ
- তামিল সঙ্গম
- উপসংহার

একক ১.৩.৩. বাংলা সাহিত্য

- সূচনা
- মধ্যযুগে বাংলা সাহিত্য
- চন্ডীদাস এবং বিদ্যাপতির বৈষ্ণব গীতি কবিতা
- মালাধর বসু এবং কীর্তিবাস ওঝা
- চৈতন্য পরবর্তী বৈষ্ণব সাহিত্য
- উনিশ শতকে বাংলা সাহিত্য
- মাইকেল মধুসূদন দত্ত ও বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়
- বাংলা সাহিত্যে বিভিন্ন ধারায় প্রতিষ্ঠিত কয়েকজনের নাম
- বাংলা সাহিত্য চর্চায় আরো কিছু গুরুত্বপূর্ণ নাম

১.৪. প্রাচীন ভারতে নারী বা আদিপর্বে ভারতীয় মহিলা : (পৃষ্ঠা ৩৩-৪২)

- ভূমিকা
- তথ্যসূত্র ও আইনের দৃষ্টিতে নারী
- উপসংহার
- গণিকাদের কথা (ভূমিকা)
- গণিকাদের রাষ্ট্রীয় স্বীকৃতি ও বিভিন্ন ধরনের বারাঙ্গনা
- বিধবাদের প্রসঙ্গে দু'চার কথা (সূচনা)
- তথ্যসূত্র ও স্মারকে বিধবাদের চিত্র
- উপসংহার

পর্যায় ২.১. জৈন ও বৌদ্ধ ধর্ম (পৃষ্ঠা ৪৩-৫৩)

একক ২.১.০. প্রতিবাদী ধর্মের উদ্ভব

একক ২.১.১. জৈন ধর্ম

- সূচনা

টিপ্পনী

টিপ্পনী

- জৈন ধর্ম-মৌখিক থেকে মতবাদ
- দ্বৈতসত্ত্বা ও মুক্তিলাভের পথ
- ত্যাগ ও পবিত্রতা
- সাম্প্রতিক অবস্থা
- রাজকীয় পৃষ্ঠপোষকতালাভ
- জৈন ধর্মের দুটি ধারা/ বিভক্তিকরণ
- জৈন ধর্মের প্রভাব

একক ২.১.১. বৌদ্ধ ধর্ম

- সূচনা
- বুদ্ধ ও তাঁর ধর্মমত
- মহাবীর ও গৌতমবুদ্ধ
- রাষ্ট্রীয় পৃষ্ঠপোষকতালাভ
- বৌদ্ধ ধর্মের প্রভাব

একক ২.১.১. উভয় ধর্মের সাদৃশ্য

পর্যায় ২.২. সুফিবাদ ও ভক্তি আন্দোলন (পৃষ্ঠা ৫৫-৬৪)

একক ২.২.১. সুফি আন্দোলন

- পটভূমি
- সুফি, সুফিবাদ ও তার তত্ত্ব
- সুফি আন্দোলনের সূচনা ও বিস্তার
- শাসক ও সন্ত সুফি
- ইসলামের মধ্যে সুফি
- সুফিদের অবদান বা সুফিবাদের প্রভাব

একক ২.২.২. ভক্তি আন্দোলন

- পটভূমি
- ভক্তি আন্দোলনের ধারা
- বাংলাতে ভক্তি আন্দোলন
- রামানন্দ ও কবীর

- গুরু নানক
- তুলসীদাস
- দাদু-দয়াল, সুরদাস ও মীরাবাঈ
- ভক্তিবাদের প্রভাব
- সুফি ও ভক্তিবাদে উদারনৈতিক সমন্বয়
- উপসংহার

টিপ্পনী

পর্যায় ২.৩. সমাজ-সংস্কৃতির সংস্কার আন্দোলনে রাজা রামমোহন রায়, বিদ্যাসাগর, দয়ানন্দ সরস্বতী, জ্যোতিবা ফুলে এবং আম্বেদ কর (পৃষ্ঠা ৬৫-৭৬)

একক ২.৩.১. রাজা রামমোহন রায় (১৭৭২-১৮৩৩ খ্রিষ্টাব্দ)

- সূচনা
- তৎকালীন সামাজিক অবস্থা
- সমাজ সংস্কার
- শিক্ষা ও সমাজ কল্যাণের ভাবনা
- ধর্ম সংস্কার
- উপসংহার

একক ২.৩.২. ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর (১৮২০-১৮৯১ খ্রিষ্টাব্দ)

- পটভূমি
- সমাজ সংস্কার
- ধর্ম সংস্কার
- শিক্ষা ও সমাজভাবনা
- উপসংহার

একক ২.৩.৩. দয়ানন্দ সরস্বতী (১৮২৪-১৮৮৩ খ্রিষ্টাব্দ)

- সূচনা
- মতাদর্শ ও তার প্রতিষ্ঠানিকতা
- সমাজ সংস্কার ও গঠনমূলক কাজ

টিপ্পনী

- উপসংহার

একক ২.৩.৪. জ্যোতিবা ফুলে (১৮২৭-১৮৯০ খ্রিষ্টাব্দ)

- সূচনা
- স্কুলজীবন থেকেই প্রতিবাদী
- সত্যশোধক সমাজ ও অতীত মহারাষ্ট্র
- উপসংহার

একক ২.৩.৫. বি.আর. আম্বেদকর (১৮৯১-১৯৫৬ খ্রিষ্টাব্দ)

- সূচনা
- লেখনীর মাধ্যমে প্রতিবাদ ও বৌদ্ধধর্মের প্রভাব
- দ্বৈত ভূমিকা
- উপসংহার

পর্যায় ২.৪. গান্ধি ও জাতীয়তাবাদী আন্দোলন (পৃষ্ঠা ৭৭-৮৯)

- সূচনা
- সত্যাগ্রহ
- দক্ষিণ আফ্রিকায় গান্ধিজি
- তৎকালীন ভারতবর্ষের পরিস্থিতি
- গান্ধিজির ভারতীয় রাজনীতিতে যোগদান
- আঞ্চলিক সত্যাগ্রহ : চম্পারণ, আমেদাবাদ ও খেদা আঞ্চলিক ক্ষেত্রগুলির মূল্যায়ন
- রাওলাট সত্যাগ্রহ ও পাঞ্জাব সন্ত্রাস
- খিলাফৎ আন্দোলন
- অসহযোগ আন্দোলন
- আইন অমান্য আন্দোলন, গোলটেবিল ও গান্ধি-আরউইন চুক্তি

মুখবন্ধ / ভূমিকা

টিপ্পনী

‘ভারতের ঐতিহ্য এবং সংস্কৃতি’ এটি কোনো গ্রন্থ নয়, বরং একটি পাঠ্যসূচি। ত্রিপুরা বিশ্ববিদ্যালয় স্নাতকস্তরের যে পাঠ্যক্রম তৈরি করেছে মূলতঃ তার ভিত্তিতে এই সংক্ষিপ্ত রচনা। ভাষাচার্য্য সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়, Culture বা সংস্কৃতি শব্দের আলোচনা প্রসঙ্গে বক্তব্য করেছেন যে, Civilization বা সভ্যতা বলতে ব্যাপকভাবে উৎকর্ষপ্রাপ্ত বা উন্নত মানব সমাজের বহিরঙ্গতার উন্নত জীবনযাত্রা পদ্ধতি, তার সামাজিক রীতিনীতি, তার রাষ্ট্রনীতি তার রূপশিল্প, পূত, সাহিত্য ও ধর্ম এ সকলকে বোঝায়। বলাবাহুল্য, ভারতীয় ঐতিহ্য এবং সংস্কৃতির ব্রতীর অনুসন্ধানে বা বিশ্লেষণ এর কোনোটাই এখানে নেই। এখানে পাঠক্রমের নির্দেশিত পথে বিশেষত ছাত্রছাত্রীদের কথা মাথায় রেখেই মূল বিষয়বস্তু আলোচনা করা হয়েছে। তবে, বিস্তারিত জানতে একক ভিত্তিক গ্রন্থতালিকাগুলি বিশেষ উপযোগী হবে এই দাবি করা যেতেই পারে।

সমগ্র পাঠক্রম মোট আটটি এককে আলোচিত হয়েছে। প্রথম পর্যায়ের প্রথম এককে সিন্ধু সভ্যতা ও বৈদিক সভ্যতার মধ্যে তুলনামূলক আলোচনায় উভয় সভ্যতার উন্মেষ সম্পর্কে বিবৃত করা হয়েছে। দুটি সভ্যতায় বেশ কিছু সাদৃশ্য লক্ষ্য করা গেলেও আমূল বৈসাদৃশ্যও উঠে এসেছে। ইতিহাস স্বীকৃত হরপ্পা বা সিন্ধু সভ্যতা নগরকেন্দ্রিক হলেও, নাগরিক জীবনের বর্ণলিপি এখনো পাঠোদ্ধার করা সম্ভব হয়নি। এদিক থেকে বৈদিক সভ্যতার লিখিত উপাদান হেতুই আজও তার বাস্তব রূপরেখা বিদ্যমান। তবে, প্রত্নতাত্ত্বিক পক্ষে সেই সময়ের নিরীখে সিন্ধুর উন্নততর নগরায়ন আজও বিসময় জানায় বা নজর কাড়ে। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, কেবল তুলনামূলক আলোচনার ভিত্তিতে উভয় সভ্যতা আলোকপাত করা হয়েছে।

দ্বিতীয় এককে মেষি, শুঙ্গা, পল্লব, চোল ও মোগল শিল্প-স্থাপত্য পৃথক পৃথক ভাবে আলোচনা করা হয়েছে।

তৃতীয়টিতে পঞ্চদশ থেকে অষ্টাদশ শতকে সংস্কৃত, সঙ্গম ও বাংলা সাহিত্যের উৎপত্তি ও পর্যায়ক্রম বিবৃত করা হয়েছে।

চতুর্থ এককে প্রাচীন ভারতের নারী সম্পর্কে রাষ্ট্রীয় দৃষ্টিভঙ্গী, তাঁদের সামাজিক মানমর্যাদা, নারীর বিভিন্ন অবস্থান - কণিকা বা বিধবা প্রভৃতি কথাও উঠে এসেছে। প্রাচীন ভারতে বেশকিছু নারীর দৃষ্টান্ত যাঁরা স্বমহিমায় আত্মপ্রকাশ করতে পেরেছিলেন সেই দিকটিও পর্যালোচনা করা হয়েছে।

দ্বিতীয় পর্যায়ের প্রথম এককটি হল জৈন ও বৌদ্ধ ধর্ম বিষয়ক আলোচনা। প্রতিবাদী ধর্মের উদ্ভব সম্পর্কে সম্যক ধারণার মধ্য দিয়ে জৈন ও বৌদ্ধ ধর্মের মূল আলোচনায় প্রবেশ করা হয়েছে। জৈন ধর্মের বিশেষত্ব ও তার বিকাশ সম্পর্কে যেমন আলোচিত হয়েছে তেমনি জৈন ধর্মের বিকাশের সীমাবদ্ধতার দিকটিও আলোচনায় উঠে এসেছে। বৌদ্ধ ধর্ম সম্পর্কে একইপর্বে আলোচনা করা হয়েছে। তবে, বৌদ্ধ ধর্মের সীমাবদ্ধতা তুলনার নিরীখে ছিল না বললেই চলে। বরং দেখা গেছে সমুন্নতিতে (বিশেষত মৌর্য সম্রাট অশোকের ঐকান্তিক প্রচেষ্টায়) বৌদ্ধ ধর্ম বিশ্বধর্মের আঙিনায় পৌছাতে পেরেছিল। আলোচনায় দেখা গেছে এই দুটি ধর্মের সাদৃশ্য-বৈসাদৃশ্য থাকলেও বৌদ্ধধর্ম

টিপ্পনী

অধিকতর মানুষের কাছে গ্রহণযোগ্য হয়ে উঠেছিল।

দ্বিতীয় এককে উঠে এসেছে সুফি ও ভক্তি আন্দোলন মধ্যক্রমে সমাজ সংস্কারে যে আমূল পরিবর্তন ঘটিয়ে ছিল তা নিঃসন্দেহে বৈপ্লবিক ছিল। আরো বৈপ্লবিক কারণ মানবতা তথা মানুষের জয়গানে স্বতঃস্ফূর্ত এমন সাড়া আর কখনও ভারত ইতিহাসে দেখা যায়নি। সুফিদের উৎপত্তি ও তাঁদের মতবাদ সর্বপরি আন্দোলনের রূপ সবকিছুই আলোচনায় তুলে ধরা হয়েছে। সুফি ও ভক্তি উভয় ক্ষেত্রেই বেশ কিছু সন্তের সমকথা আলোচনায় যথাযথপর্বে উঠে এসেছে।

তৃতীয় এককটিতে সমাজ-সংস্কৃতির সংস্কার আন্দোলনে রাজা রামমোহন রায়, বিদ্যাসাগর, দয়ানন্দ সরস্বতী, জ্যোতিরাও ফুলে ও ডঃ বি.আর আম্বেদকরের ভূমিকার বিভিন্ন দিকগুলি স্পর্শ করা হয়েছে। কেন রামমোহন আধুনিক ভারতের রূপকার? বা পাচ্য-পাশচাত্যের যা কিছু ভালো তার নির্যাস অন্বেষণে তাঁর ভূমিকা ঠিক কীরূপ ছিল? সেই দিক দুটিও আলোচনা করা হয়েছে। একই সঙ্গে সতীদাহ প্রথা নিবারণে তাঁর আন্তঃরিক প্রচেষ্টার দিকটিও বর্ণনায় যথাযথ উঠে এসেছে। আলোচনায় বিদ্যাসাগর মহাশয়ের নারী শিক্ষা বা বিধবা বিবাহ প্রচলনের অন্তহীন প্রচেষ্টার দিকদুটি বেশি করে গুরুত্ব আরোপ করা হয়েছে। একজন অতিসাধারণ মানুষ প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষাবিহীন কীভাবে সমাজের মঙ্গলসাধন করতে পারে তার অন্যতম দৃষ্টান্ত দয়ানন্দ সরস্বতী এবং তারই আলোকুজ্জ্বল দৃষ্টান্ত বহন করে চলেছিল তাঁর প্রতিষ্ঠিত 'আর্যসামন্ত'। একইভাবে মহারাষ্ট্রের ক্ষেত্রে উঠে এসেছে জ্যোতিরাও ফুলে ও তাঁর প্রতিষ্ঠিত 'সত্যশোধক' সমাজ। ভারতীয় সমাজে কুসংস্কার, আচারবিধি, অসপৃষ্যতা ও জাতপাতের বিরুদ্ধে আম্বেদকরের ভূমিকা যথাযথপর্বে পর্যালোচনা করা হয়েছে। এছাড়া, জাতীয় রাজনীতি বা সাংবিধানিক বিষয়েও তাঁর ভূমিকা ছিল অগ্রগণ্য।

এই পর্যায়ের শেষতম এককটি হল গান্ধি ও জাতীয়তাবাদী আন্দোলন এখানে গান্ধির ন্যায়তত্ত্ব গঠনে পারিবারিক ভূমিকা বা বিভিন্ন মৌলিক রচনার প্রভাবের দিকগুলি স্পর্শ করা হয়েছে। এছাড়া, দক্ষিণ আফ্রিকায় গান্ধির অভিজ্ঞতা এবং ভারতে আঞ্চলিক সত্যাগ্রহের বাস্তব ফলপ্রসূর মধ্য থেকে জাতীয় আন্দোলনে তাঁর অগ্রগণ্য ভূমিকার দিকটিও আলোচনায় যথাযথ ভাবে উঠে এসেছে।

যেসব শিক্ষক মহাশয় ও বন্ধুগণ এই কাজে আমাকে পরামর্শ ও সাহায্য করেছেন তাঁদের কখনোই ভুলার নয়, এইপর্বে সেই কৃতজ্ঞতা স্বীকার করছি। বিকাশ পাবলিশিং হাউস প্রাইভেট লিমিটেড আমাকে লেখার সুযোগ দিয়ে যেভাবে দ্রুত ছাপানোর দায়ভার গ্রহণ করেছে তা কতটা দায়িত্ব সহকারে পালন করলাম - ছাত্রছাত্রীরাই তার উত্তরদাতা। এই পাঠক্রমে যা কিছু ভুলত্রুটি আছে তার দায়ভার একান্তভাবেই আমার। পরবর্তী সংস্করণে সুযোগ পেলে সেই ভুল অবশ্যই আমি শুধরে নেওয়ার চেষ্টা করব।

.পর্যায় ১.১ সিন্ধু সভ্যতা ও বৈদিক সভ্যতার তুলনামূলক আলোচনা ঃ

১.১.১. সূচনা

১.১.২. দুটি সভ্যতার উল্লেখ

১.১.৩. তুলনামূলক আলোচনা: সাদৃশ্য ও বৈসাদৃশ্য

টিপ্পনী

১.১.১ সূচনা :

বিংশ শতকের দ্বিতীয় দশক নাগাদ প্রাচীন ভারতের ইতিহাসের সূচনাপর্ব ছিল আলোকজ্জ্বল বৈদিক সভ্যতা। কিন্তু এই শতকের তৃতীয় দশকে উঠে এসেছিল নিত্যনতুন প্রত্নতাত্ত্বিক নিদর্শন যা কিনা সিন্ধু নদীর অববাহিকা অথবা হরপ্পা বা অন্যত্রও কম বেশী পাওয়া গেছে। এরূপ প্রেক্ষাপটে বৈদিক সভ্যতার আলোকজ্জ্বল সূচনা পর্বের মান কিছুটা অন্তত ম্লান হয়েছিল একথা বললে অতুক্তি হয়না। কিন্তু সে বিষয়ে ঐতিহাসিকরা দ্বিমত পোষণ করেছেন তা হল বৈদিক আর্যসভ্যতা প্রাচীন ভারতবর্ষের ইতিহাসে গৌরবময় সূচনাপর্বের স্থান অধিকার করে আছে নাকি হারিয়েছে। তথাপি, সিন্ধু ও বৈদিক উভয় সভ্যতার তুলনামূলক আলোচনার আগে এ সম্পর্কে দুচার কথা বলা প্রয়োজন। এন. এস. রাজারাম-এর মতে ঋগ্বেদের আমলে সরস্বতী ছিল উত্তর-ভারতের প্রধান নদী। অনেক ভূ-বিজ্ঞানীর মতে সরস্বতী নদী শুকিয়ে যাবার ফলেই থর মরুভূমি সৃষ্টি হয়েছে। তাঁদের ধারণা সরস্বতী নদী প্রবাহমান থাকার ফলে বেদের আমলে সভ্যতার উল্লেখ সম্পর্কে আলোচনা করা যেতে পারে।

১.১.২. দুটি সভ্যতার উন্মেষ :

রোমিলা থাপারের ভারতবর্ষের ইতিহাস থেকে জানা যায়, ভারতে মানুষের গতিবিধির সন্ধান মিলেছে খ্রিষ্টপূর্ব চার লক্ষ থেকে দু'লক্ষ বছর আগে দ্বিতীয় হিমযুগের সময়ে। তখন প্রস্তর হাতিয়ারের ব্যবহার হতো। তারপর দীর্ঘদিন ধীরে ধীরে ক্রমবিবর্তনের পালা চলে। কিন্তু শেষদিকে বিবর্তনের সর্বত কিছুটা দ্রুত হয়ে চমকপ্রদ সিন্ধুসভ্যতার জন্ম হয়। ইদানীংকালে যাকে বলা হচ্ছে হরপ্পা সভ্যতা, আনুমাণিক সময় তখন ২৩০০ খ্রিষ্টপূর্বাব্দ। নাল সংস্কৃতির সে নমুনা পাওয়া গেছে তার থেকে প্রমান হয় সেটিই ছিল প্রাক্ হরপ্পা সভ্যতার কয়েকটি গ্রামের অস্তিত্বর। এছাড়া দৃষ্টান্ত হিসাবে উঠে এসেছে মাকরান উপকূলের কুল্লি সংস্কৃতি। আরও পাওয়া যাবে, রাজস্থান ও পাঞ্জাবের নদীগুলির তীরে তীরে কয়েকটি গ্রাম্য গোষ্ঠীর মধ্যে। পাঞ্জাব ও সিন্ধুর সমভূমি, উত্তর রাজস্থান এবং পশ্চিম ভারতের কাথিয়াওবাড় অঞ্চলগুলিকে বিভিন্ন প্রাচীন সভ্যতার মধ্যে হরপ্পা সভ্যতাই ছিল সবচেয়ে ব্যাপক। এটি অবশ্য একান্তভাবেই নগরকেন্দ্রিক সভ্যতা আর ক্ষমতার প্রধান কেন্দ্র ছিল মহেঞ্জোদাড়ো ও হরপ্পা শহর দুটি। সম্প্রতি খননকার্যের ফলে আরো কয়েকটি শহরের সন্ধান পাওয়া গেছে। যেমন সিন্ধুতে কোট ডিজি, রাজস্থানের কালিবঙ্গান, পাঞ্জাবে রূপার এবং গুজরাটের একটি বন্দর লোথাল। কিন্তু হরপ্পা সভ্যতা ও পরবর্তী আর্য-সভ্যতার মধ্যে আর কোনো ধারাবাহিকতা থাকতে পারল না তার কারন হল, খ্রিষ্টপূর্ব দ্বিতীয় সহস্রাব্দের গোড়ার দিকে অপেক্ষাকৃত অসভ্য জাতির লোকেদের সিন্ধু উপত্যকায় আগমন। ১৭০০ খ্রিষ্টপূর্বাব্দের মধ্যেই হরপ্পা বা সিন্ধু সভ্যতার দিন ফুরিয়ে এসেছিল। এরপরে খ্রিষ্টপূর্ব ১৫০০ সাল নাগাদ ইরান থেকে ইন্দো-আর্যরা এসে পড়ে উত্তর-পশ্চিম ভারতের সংস্কৃতিতে নতুন কিছু বৈশিষ্ট্যের আমদানি করল যা কিনা বৈদিক সভ্যতার মধ্যে আরো বেশী প্রকটিত হয়ে উঠল। সিন্ধু থেকে অঙ্গার অববাহিকা পর্যন্ত বিশাল অঞ্চল ছিল উর্বরা কৃষিক্ষেত্র। সরস্বতী নামে প্রাচীন নদীর কথা ঋগ্বেদে বিভিন্ন স্থানে বিবৃত আছে। বহুদিন আগেই যে তা শুকিয়ে যেতে শুরে করেছিলো ঋগ্বেদোত্তর পঞ্চবিংশ ব্রাহ্মণে তাঁর উল্লেখ দেখা

যায়। সম্প্রতি 'ইতিহাস দর্পন' পত্রিকার (চতুর্থ খন্ড, সংখ্যা ২,১৯৯৮) গবেষণালব্ধ তথ্য থেকে জানা যায় যে সিন্ধু নদীর তীরবর্তী হরপ্পা সভ্যতার অর্থনৈতিক ভিত্তি ছিল সরস্বতীর তীরভূমি। পন্ডিতদের মধ্যে তাই অনেকেই বৈদিক সভ্যতাকে প্রাচীনতম সভ্যতা বলে মনে করেছেন। এই ধারনায় বিশ্বাসী পন্ডিতদের মধ্যে অন্যতম হলেন বঙ্কুবিহারী চক্রবর্তী। এঁদের বক্তব্যের মূল কথা হল, আর্যরা বহিরাগত নয়, তারা ভারতীয়, ভারতবর্ষ তাদের আদি বাসস্থান। একই সঙ্গে তাঁদের বক্তব্যে উঠে এসেছে ঋগ্বেদ রচিত হয়েছিল পাঁচ হাজার খ্রিষ্ট্রপূর্বাব্দের কিছু আগে বা কিছু পরে। এঁদের মতে সিন্ধু সভ্যতার মানুষ বৈদিক সভ্যতার রীতি-নীতি, আচার-অনুষ্ঠান, পোষাক-পরিচ্ছদ, জীব-জন্তু সবকিছুই অনুকরণ করেছিল। তবে হরপ্পা বা সিন্ধু সভ্যতা যে ভারতের প্রাচীনতম সভ্যতা এ বিষয়ে ঐতিহাসিকদের অধিকাংশই একমত। স্যার জন মার্শাল সিন্ধু ও বৈদিক সভ্যতাকে সম্পূর্ণ আলাদা বলে দেখাবার চেষ্টা করেছেন। ডঃ রায়চৌধুরী, ডঃ মজুমদার আর্য সভ্যতাকে ভারতের সভ্যতা বলে স্বীকার করেননি। অধিকাংশ পন্ডিতদের মতে বিশ্বের প্রাচীনতম গ্রন্থ বেদ রচিত হয়েছিল আনুমাণিক ১৫০০ খ্রিষ্টপূর্বাব্দে। অতএব বৈদিক সভ্যতার সময়কাল ১৫০০ খ্রিষ্টপূর্বাব্দ বা তার পরে বলে স্থির করা যেতে পারে। অন্যদিকে প্রত্নবস্তুর সাক্ষ্যের ভিত্তিতে প্রত্নতত্ত্ববিদরা অনুমান করেন যে সিন্ধু সভ্যতা গড়ে উঠেছিল আনুমাণিক ২৩০০ থেকে ১৭৫০ খ্রিষ্টপূর্বাব্দের মধ্যে। সময়ের ব্যবধানই শুধু নয় সিন্ধু সভ্যতা ও আর্য সভ্যতার প্রকৃতি ছিল সম্পূর্ণ আলাদা, যা থেকে প্রমাণিত হয় যে হরপ্পা সভ্যতা বৈদিক সভ্যতার পূর্ববর্তী।এবিষয়ে উভয় একইভাবে জাতিবিদ্যাগত অনুসন্ধানে ভারতীয় উপমহাদেশে প্রধান ছয়টি হাতির সন্ধান পাওয়া গেছে। এগুলির ক্রমান্বয়ে দেখা গেছে নেগ্রিটো, প্রোটো-অস্ট্রালসেড়, মঙ্গোলয়েড, মেডিটেরেনিয়ান এবং এর পরবর্তীরা আর্য-সভ্যতার সঙ্গে সংশ্লিষ্ট হয়েছে। হরপ্পা অঞ্চলে নেগ্রিটো ও পরবর্তী আর্যদের সংশ্লিষ্ট বাদে সবকটিরই কঙ্কাল পাওয়া গেছে। ভারতবর্ষে অস্ট্রিক ভাষাগোষ্ঠীভুক্ত প্রোটো-অস্ট্রালসেড শ্রেণীর লোকের সংখ্যাধিক্যই বেশী। এর প্রকৃষ্ট দৃষ্টান্ত আদিম গুন্ডা উপজাতি গোষ্ঠী। কিন্তু ভূমধ্যসাগরীয় জাতির প্রধান যোগ ছিল দ্রাবিড় সভ্যতার সঙ্গে। আর মঙ্গোলসেড গোষ্টীর লোকের প্রধান বাসভূমি ছিল উপমহাদেশের উত্তরপূর্ব ও উত্তর অঞ্চলগুলিতে। এদের ভাষার সঙ্গে চীন-তিব্বতীয় ভাষাগোষ্ঠীর সাদৃশ্য আছে। এদেশে সবশেষে ইন্দো-ইউরোপীয় ভাষাগোষ্ঠী হল 'আর্য'। এরূপ প্রেক্ষাপটে উভয় সভ্যতার মধ্যে একটি তুলনামূলক আলোচনা করা যেতে পারে।

তুলনামূলক আলোচনা :

সাদৃশ্য : ভারতবর্ষই হল আর্যদের বাসভূমি এবং বৈদিক সভ্যতা হল হরপ্পা সভ্যতারই এক অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ। এই বক্তব্যের ঐতিহাসিকদের মতানুযায়ী দুই সভ্যতার মধ্যে ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক পরিলক্ষিত হয়েছে। যথা- উভয় সভ্যতার মানুষের খাদ্য ও পোষাক-পরিচ্ছদ ছিল একই রকম। পোষাকে ধুতি ও চাদর জাতীয় বস্ত্রের নজির লক্ষ্য করা যায়। অবশ্য, এ বিষয়ে কোন নমুনা পাওয়া যায়নি ঠিকই কিন্তু উপত্যকায় প্রাপ্ত মূর্তিগুলি থেকে এ বিষয়ে অনুমান করা হয়েছে। হরপ্পার ক্ষেত্রে দেখা গেছে স্ত্রী-পুরুষের পোশাকে বিশেষ পার্থক্য ছিল না। স্ত্রী এবং পুরুষ উভয়েই অলঙ্কার ব্যবহার করত। বিচিত্র রকমের আংটি, গলার হার, কঙ্কণ ইত্যাদি ভারতবর্ষের বিভিন্ন মিউজিয়ামে এখনো সংরক্ষিত আছে। সংরক্ষিত অলঙ্কারগুলি নির্মাণে সোনা, রূপা এবং নানা মূল্যবান ধাতু ব্যবহৃত হয়েছে। এই দিকটিও উভয় সভ্যতাতে প্রায় একইরকমভাবে উঠে এসেছে। অপরদিকে খাদ্যের তালিকায় উভয়ক্ষেত্রেই গম, যব, ছাতু প্রভৃতির নাম উঠে এসেছে। তরকারী, ফল, দুধ, দুগ্ধজাত দ্রব্য ও মাংস তাদের খাদ্যতালিকায় অর্ন্তভুক্ত ছিল।

দ্বিতীয়তঃ গৃহপালিত ও বন্যজন্তুর যে সকল নিদর্শন সিন্ধু সভ্যতার কালে পাওয়া গিয়েছে সেই একই জন্তুর মাথা পাওয়া গেছে বৈদিক আমলেও। সিন্ধু উপত্যকায় প্রাপ্ত কঙ্কালগুলি থেকে কুঁজবিশিষ্ট ষাঁড়, মহিষ, ভেড়া, হাতি, উট ইত্যাদির কথা জানা যায়। একইসঙ্গে নানা

টিপ্পনী

ধরনের খেলনার মাটির ছাঁচ থেকে জানা যায় বাঘ, সিংহ, গরু, কুকুর, গাধা, বাঁদর, খরগোস ইত্যাদির কথা। বৈদিক সভ্যতাতেও ছাগল, ভেড়া, কুকুর, ষাঁড়, মহিষ বা গরু প্রভৃতির অস্তিত্ব দেখা যায়।

তৃতীয়ত: বাণিজ্যিক দিক থেকে বহুল প্রচলিত বস্ত্রবয়নের নজির উভয় সভ্যতায় দেখতে পাওয়া গেছে। এর সঙ্গে, তুলোর চাষ ও তা থেকে সূতা প্রস্তুতির দিকটি নজর কেড়েছে উভয় সভ্যতাতে। অনেকে অনুমান করেন, পশ্চিম এশিয়ায় পারস্য সাগরীয় উপকূলের সঙ্গে ইতিপূর্বে হরপ্পার যে বাণিজ্য সম্পর্ক গড়ে উঠেছিল, তা ঋক-বৈদিক স্থানেও অক্ষুন্ন ছিল। তবে, এ বিষয়ে স্পষ্ট কিছু জানা যায় না।

টিপ্পনী

চতুর্থত: নৃতাত্ত্বিক পরীক্ষায় সিন্ধু উপত্যকায় আর্যজাতির কঙ্কাল পাওয়া গেছে। সুতরাং আর্যরা সিন্ধু শহরে ছিল বা এসেছিল এটা প্রমাণিত হয়। কিন্তু হরপ্পা সংস্কৃতির অবসান স্বাভাবিকভাবে হয়নি, রক্তপাতের মধ্য দিয়ে হয়েছিল এবিষয়ে বাদানুবাদ রয়েছে। যেমন রক্তপাতের কারণ সম্পর্কে, তেমনই যারা এই রক্তপাত ঘটিয়েছিল, তাদের পরিচয় সম্পর্কে ঐতিহাসিকরা নি:সংশয় হতে পারেননি। একদল ঐতিহাসিক কিছু সংখ্যক মাথার খুলিতে ভারী অস্ত্রাঘাতের চিহ্ন এবং সিন্ধুর অন্তর্গত ঝুকরে প্রাপ্ত সীলের উপর সোজা ও ঋজু রন্ধ্রযুক্ত কুঠার অস্ত্রের মধ্যে একটা কার্যকারণ সম্পর্ক খুঁজে পান। এদের বক্তব্য অনুযায়ী এই অস্ত্র ভারতের নয়, তা উত্তর পশ্চিম ইরানীদের। আর আর্যরা যেহেতু ঐ অঞ্চলের মধ্যে দিয়ে ভারতে এসেছিল তাই তাঁদের অনুমিত ঐ আক্রমণকারীরা ছিল আর্য। আবার ঋগ্বেদে বর্ণিত 'হরিযূপীয়ার' যুদ্ধকে হুইলার সহ অনেকেই হরপ্পার যুদ্ধ বলেছেন। আবার, দেবরাজ ইন্দ্রকে ঋগ্বেদে পুরন্দর বা নগর ধ্বংসকারীও বলা হয়েছে। এও ঠিক সেই সময়ে ভারতবর্ষে হরপ্পা বা সিন্ধু ছাড়া আর কোন নগর সভ্যতা ছিল না। তাই এখান থেকে প্রতীয়মান হয় যে আক্রমণকারীরা ছিল আর্য। কিন্তু একথা মনে রাখতে হবে আক্রমণকারীরা অনেকে বেলুচিস্তান থেকেও এসেছিল। এবিষয়ে এ.এল.বাসামের উক্তি স্মরণীয়। তিনি বলেছেন, এমন পর্যাপ্ত তথ্য প্রমাণ নেই। যার সাহায্যে, ধ্বংসকারীরা আর্য ছিল, একথা নিশ্চিতভাবে বলা যায়। তথাপি, একথা মেনে নিতে হয় আর্যরা সিন্ধু শহরে ছিল নতুবা তাদের মধ্যে পারস্পরিক যোগাযোগ গড়ে উঠেছিল।

সিন্ধু সভ্যতা ও বৈদিক সভ্যতার মধ্যে উপরোক্ত ক্ষেত্রে সাদৃশ্য লক্ষ্য করা গেলেও উভয় সভ্যতার বৈসাদৃশ্য ছিল অনেক বেশী। যথা– সিন্ধু সভ্যতায় অত্যাধুনিক নগর পরিকল্পনার নমুনা দেখতে পাওয়া যায়। প্রতিটি শহর বিভক্ত ছিল দুই অংশে–একটি সুরক্ষিত প্রাকারযুক্ত দুর্গের মতো অংশ যেখানে অবস্থিত ছিল নগরজীবন ও ধর্মীয় সংস্থার প্রধান কেন্দ্রগুলি; অন্য অংশে নাগরিকরা বাস করতেন। এম. হুইলার বলেছেন, মহেঞ্জোদাড়ো যখন পরিকল্পিত হয়েছিল, নগরপরিকল্পনা তখন শুধুমাত্র পরীক্ষা-নিরীক্ষার পর্যায়ে ছিল না, একটি উন্নত স্তরে পৌঁছেছিল। বলা যেতে পারে প্রতিষ্ঠিত হরপ্পা নগরী তাঁর সেই সিদ্ধান্তকে সীলমোহর দিয়েছে। হরপ্পার ধ্বংসাবশেষে সে বিরাট শস্যাগার উঠে এসেছে তাও ছিল নজরকাড়ার মতো। এর আয়তন প্রায় ১৬৯ ফুট x ১৩৫ ফুট। এ. এল. বাসাম একে রাষ্ট্রীয় ব্যাঙ্কের সাথে তুলনা করেছেন। হুইলার বলেছেন, পরিকল্পনায় বা উৎকর্ষে, সিন্ধু উপত্যকার শস্যাগারগুলির সঙ্গে তুলনীয় কোন শস্যাগার খ্রিষ্টপূর্ব পঞ্চম শতাব্দীর পূর্বে পৃথিবীর কোথাও পাওয়া যায়নি। এছাড়া, মহেঞ্জোদাড়োর দুর্গ অঞ্চলেই সর্বসাধারণের ব্যবহারোপযোগী একটি বিরাট বাঁধানো স্নানাগারও আবিষ্কৃত হয়েছে। এর আয়তন দৈর্ঘ্যে ১৮০ ফুট ও প্রস্থে ১০৮ ফুট। এর চারিদিকে ঘিরে রয়েছে ৮ ফুট উঁচু ইটের দেওয়াল। আর কেন্দ্রস্থলে জলাশয়টির আয়তন যথাক্রমে দৈর্ঘ্য-প্রস্থ ও গভীরতায় প্রায় ৩৯ x ২৩ x ৮ ফুট। এছাড়া, খননকার্যের ফলে প্রাপ্ত বড়ো বড়ো অট্টালিকার ধ্বংসাবশেষ, প্রশস্ত রাস্তাঘাট, উন্নত জলনিকাশী ব্যবস্থা প্রভৃতি থেকে হরপ্পা বা সিন্ধুসভ্যতাকে নগরভিত্তিক সভ্যতা বলে বর্ণনা করার ক্ষেত্রে কোনো দ্বিমত থাকতে পারে না। অপর পক্ষে, বৈদিক সভ্যতা

ছিল গ্রামীণ সভ্যতা। আর্যদের আর্থসামাজিক জীবনযাত্রা সম্পূর্ণভাবে গ্রামের উপর নির্ভরশীল ছিল। দেখা গেছে আর্যরা যখন এসেছিল তখন তারা ছিল অর্দ-যাযাবর গো-পালক।

ক্রমান্বয়ে বা সময়ান্তে তাদের জীবিকা-রীতিতে ঘটেছিল পরিবর্তন। চাষবাসের মধ্যে দিয়েই এসেছিল ব্যবসা-বাণিজ্য। শাসন-পরিচালনার ক্ষেত্রে দেখা গেল গোষ্ঠী বা 'সভা' ও 'সমিতি'। প্রাথমিক শাসনব্যবস্থার দৃষ্টান্তে উঠে এসেছে রাজাই ছিল ক্ষমতার কেন্দ্রে এবং তা ছিল সুবিন্যস্ত। উপজাতীয় রাজ্যে (রাষ্ট্রে) থাকত বিভিন্ন উপজাতি(জন), উপজাতি গোষ্ঠী(বিশ) এবং গ্রাম। এর কেন্দ্রে ছিল পরিবার (কুলপা)। গ্রামের প্রধান ব্যাক্তিরা ও গোষ্ঠীর প্রধানরা রাজাকে সাহায্য করতেন। আর্যদের ঘরবাড়িগুলি ছিল মূলত বাঁশ ও খড়ের তৈরী।

টিপ্পনী

দ্বিতীয়ত:, সিন্ধু বা হরপ্পা সভ্যতা ছিল তাম্র-প্রস্তর যুগের সভ্যতা। কারণ এই সময়ের মানুষ তামার সঙ্গে টিন ধাতু মিশিয়ে ব্রোঞ্জ নামে এক সংকর ধাতুর ব্যবহারের সঙ্গে সঙ্গে পাথরের ব্যবহারও করেছিল। তাই এই যুগকে 'তাম্র-প্রস্তর যুগ' (chalcalithic Age) বলা যায়। এই যুগে লোহার ব্যবহার শুরু হয়নি। পক্ষান্তরে, বৈদিক সভ্যতা ছিল লৌহযুগের সভ্যতা। ভারতবর্ষের ইতিহাসে প্রায় ৮০০ খ্রিষ্টপূর্বাব্দ পর্যন্ত লোহার ব্যবহার ঘটেনি। ৭০০ খ্রিষ্টপূর্বাব্দের সময় থেকে লৌহবস্তুর ব্যবহারের মধ্য দিয়েই ঘটেছিল আমূল পরিবর্তন। সম্প্রতি, ভারতবর্ষে লোহার ব্যবহার আরো প্রাচীন বলে প্রতীয়মান হয়েছে।

তৃতীয়ত:, সিন্ধু বা হরপ্পার অর্থনীতিতে শিল্প-বাণিজ্য ছিল প্রধান। এক্ষেত্রে দেখা গেছে শুধু স্থলপথ নয়, জলপথেও তাদের বাণিজ্য বিস্তার লাভ করেছিল। লোথাল-এ খননকার্যের ফলে আবিষ্কৃত ব্যাপক সামুদ্রিক বাণিজ্যের ইঙ্গিত বহন করে। একইসঙ্গে অর্থনীতি ছিল শিল্পনির্ভর। অপরদিকে বৈদিক আর্যসভ্যতার আর্থিকভিত্তি ছিল পশুপালন ও কৃষিনির্ভর। একথা ইতিপূর্বে বিবৃত আর্যরা এদেশে এসেছিল অর্ধ-যাযাবর গো-পালক হয়ে। গোপালই ছিল তাদের প্রধান জীবিকা। গোধনের মূল্য ও মহার্ঘ ছিল একেবারে উচ্চস্থানে। কিন্তু তারা যখন স্থায়ীভাবে বসবাস শুরু করেছিল তখন তাদের জীবিকা রীতিতে বেশ কিছু পরিবর্তন লক্ষ্য করা যায়। দেখা গেছে, চাষবাসই তাদের জীবনযাত্রার মানকে বদলে দিয়েছিল। একইসঙ্গে কৃষিকাজে মনোনিবেস করার ফলে নতুন নতুন জীবিকারও উদ্ভব ঘটেছিল।

চতুর্থত, উভয় সভ্যতাতে বহু জীবজন্তুর মধ্যে সাদৃশ্য লক্ষ্য করা গেলেও ঘোড়ার ক্ষেত্রে ব্যতিক্রম লক্ষ্য করা যায়। তবে ইদানীংকালে খননকার্যের ফলে এই সন্দেহের তীব্রতা অনেকটাই কমে গেছে। কালিবঙ্গান এবং সুরকোতদরে মাটির তলায়, খুব গভীরে না হলেও ঘোড়ার চিহ্ন পাওয়া গেছে। তথাপি বলা যেতে পারে এই সভ্যতার শেষের দিকে ঘোড়ার অস্তিত্ব ছিল। আবার বেলুচিস্তানে মাটির গভীরের নিম্নতম স্থানে ঘোড়ার কয়েকটি দাঁত পাওয়া গেছে। সুতরাং উভয় সভ্যতাতে ঘোড়ার অস্তিত্ব যে ছিল তা জোর দিয়েই বলা যায়। কিন্তু বৈদিক সভ্যতার ন্যায় ঘোড়ার বহুল ব্যবহার সিন্ধু বা হরপ্পার দেখা যায় না।

পঞ্চমত:, হরপ্পা বা সিন্ধু সভ্যতায় লিখনরীতি সুপ্রচলিত ছিল। ঐতিহাসিকরা 'প্রোটো-হিস্টোরিক' (Proto-Historic) বা 'প্রায়-ঐতিহাসিক' যুগ বলতে সেই সময়কে বুঝিয়েছেন,যখন থেকে লিপির ব্যহার শুরু হয়েছে। দৃষ্টান্তস্বরূপ সিন্ধু বা হরপ্পা সংস্কৃতির কথা বলা যায়, যদিও সেসমস্ত লিপির পাঠোদ্বার এখনও সম্ভব হয়নি। অপরপক্ষে বৈদিক সভ্যতার মানুষের কোনো লিপিজ্ঞান ছিল না।

ষষ্ঠত:, উভয় সভ্যতার পূজাপদ্ধতিকেও যথেষ্ট পার্থক্য ছিল। হরপ্পার ধ্যানধারণা যেমন ঋকবেদে অনুপস্থিত, তেমনই বৈদিক স্তোত্রগুলির পরিপূরক চিত্রও হরপ্পা সংস্কৃতিতে খুঁজে পাওয়া যায় না। হরপ্পা সংস্কৃতিতে অর্ধ-নগ্ন দন্ডায়মান অসংখ্য নারীমূর্তি পাওয়া গেছে। এর থেকে প্রতীয়মান হয় যে, হরপ্পা বা সিন্ধু সভ্যতায় মূর্তিপূজার প্রচলন ছিল, কিন্তু বৈদিক

সংস্কৃতিতে তা অজ্ঞাত ছিল। তারা ছিল প্রকৃতি পূজারী। সিন্ধু বা হরপ্পা সভ্যতায় বৃষের পূজা প্রচলন ছিল। কিন্তু বৈদিক সভ্যতায় পূজিত ছিল গর্দভ। আবার পুরুষ দেবতাদের মধ্যে যিনি সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য একটি সীল-এ দেখা যায় তাঁর তিনটি মুখ। হিন্দু দেবতা শিব সম্পর্কিত ধারণার সঙ্গে এই মূর্তিটির বেশ কয়েকটি ক্ষেত্রে আশ্চর্যজনক মিল দেখা যায়। তথাপি, সিন্ধু বা হরপ্পাবাসী শিবলিঙ্গ ও মাতৃদেবীর পূজা করত। কিন্তু বৈদিক আর্য সভ্যতায় লিঙ্গপূজা ছিল নিন্দনীয়। সিন্ধু বা হরপ্পায় মন্দিরের অস্তিত্ব ছিল কিনা সে সম্পর্কে ঐতিহাসিকদের মধ্যে বাদানুবাদ রয়েছে। অনেকে এখানে স্থিত অট্টালিকাগুলিকে মন্দির রূপে গন্য করতে চেয়েছেন। এ.এল.বাসাম সংশয় প্রকাশ করে বলেছেন যে এগুলির অভ্যন্তরে কোন দেবদেবীর মূর্তি পাওয়া যায়নি। অপরদিকে বৈদিক সভ্যতায় মন্দিরের স্থান ছিল গুরুত্বপূর্ণ-যা কিনা সর্বত্রই পাওয়া যায়।

টিপ্পনী

সপ্তমত:, হরপ্পা বা সিন্ধু সভ্যতার যুগধর্ম ছিল মাতৃতান্ত্রিক। বিভিন্ন সীল, নারীমূর্তি ও প্রস্তরমূর্তি সেই সাক্ষ্য বহন করে চলেছে। তবে সিন্ধু উপত্যকায় রাজশক্তি ছিল কিনা এবিষয়ে অনিশ্চয়তা থাকলেও সর্বসাধারণের প্রকাশ্য, কেন্দ্রীয় একটি শাসকগোষ্ঠীর অস্তিত্ব সম্পর্কে কোন সংশয় আসে না। অপরদিকে, বৈদিক আর্যসভ্যতা হল পিতৃতান্ত্রিক এবং শাসনব্যবস্থার কেন্দ্রে ছিল স্বয়ং রাজা। পূর্বে আলোচিত, রাষ্ট্র, জন, বিশ, কুল বা কুলপা প্রভৃতি এবিষয়ে সাক্ষ্যপ্রদান করেছে।

অষ্টমত:, সিন্ধু বা হরপ্পা সভ্যতার মানুষ আত্মরক্ষামূলক অস্ত্রের ব্যবহার জানত না বলে অনুমান করা যায়। শিরস্ত্রাণ বা বর্মের ব্যবহার সিন্ধু বা হরপ্পাবাসীর অজানা ছিল। কিন্তু বৈদিক আর্যরা যুদ্ধবিদ্যায় বিশেষ পারদর্শী ছিল। তারা আত্মরক্ষা ও প্রতিরক্ষা দুধরনের অস্ত্রেরই ব্যবহার জানত। লোহার ব্যবহারের সঙ্গে সঙ্গে যে আমূল পরিবর্তন এসেছিল অস্ত্র-শস্ত্র ও রণকৌশলে তার নজির লক্ষ্য করা যায়।

নবমত:, হরপ্পা সভ্যতার ধ্বংসাবশেষ থেকে প্রাপ্তগুলি ছিল কালো ও লাল। সেগুলি দেখলে মনে হবে তারা মৃৎপাত্রের উজ্জ্বলতা বৃদ্ধির ওপর বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করত। কিন্তু বৈদিক আর্যদের ব্যবহৃত মৃৎপাত্রগুলি ছিল ধূসর বর্ণের এবং এগুলির উজ্জ্বলতা বৃদ্ধির দিকে গুরুত্ব দেওয়া হোত না। গুণগত বিচারে এগুলি ছিল নিম্নমানের। প্রসঙ্গত উল্লেখ্যনীয় সিন্ধু বা হরপ্পা সংস্কৃতির মানুষজন খুব শিল্পরুচিসম্পন্ন ছিল, একথা বলা যায় না। শিল্পের জন্য শিল্প, এই নীতিতে তাদের আদৌ বিশ্বাস ছিল না। মৃৎপাত্রে তাদের গুণগত দিকটি উঠে এসেছে। আয়তন বা ব্যাপ্তির দিক থেকে দেখা যায় (প্রত্নতাত্ত্বিক আবিষ্কার এ গবেষণায়) সিন্ধু বা হরপ্পা সংস্কৃতি মূলত ভারতের উত্তর-পশ্চিম প্রান্তে গড়ে ওঠে এবং পরে তার প্রভাব গাঙ্গেয় সমভূমি ও দক্ষিণে নর্মদা নদীর মোহনা অব্দি ছড়িয়ে পড়ে। অপরদিকে বৈদিক আর্যসভ্যতার বিস্তার ঘটেছে আরো পরে। এমনকি সম্প্রতি সেই ধারা অক্ষুন্ন আছে।

হরপ্পা বা সিন্ধু সভ্যতার অধিবাসীরা সাধারণত মৃতদেহকে কবর দিত। তবে মহেঞ্জোদারোয় প্রাপ্ত কবরগুলিতে অন্ত্যেষ্টিক্রিয়ায় ভিন্নতা লক্ষ্য করা যায়।

প্রশ্নাবলী:

১. সিন্ধু ও বৈদিক সভ্যতার সাদৃশ্য আলোচনা করুন।

২. সিন্ধু সভ্যতার উন্মেষ সম্পর্কে কী জানেন?

৩. বৈদিক সভ্যতার উন্মেষ সম্পর্কে আলোচনা করুন।

৪. সিন্ধু ও বৈদিক সভ্যতার তুলনামূলক আলোচনা করুন।

সংক্ষিপ্ত:

১. সিন্ধু সভ্যতার সময়কাল উল্লেখ করুন।

২. ঋক্ বৈদিক ও পরবর্তী বৈদিক যুগের সময়কাল কত?

৩. সিন্ধু সভ্যতার দু'টি শহরের নাম লিখুন।

টিপ্পনী

৪. সিন্ধু সভ্যতার অলঙ্কারে কোন কোন ধাতু ব্যবহৃত হত?

৫. বৈদিক আর্যদের আদি বাসভূমি কোথায় ছিল?

৬. উভয় সভ্যতার দুটি গৃহপালিত জন্তুর নাম উল্লেখ করুন।

৭. মহেঞ্জোদাড়োর স্নানাগারটির আয়তন উল্লেখ করুন।

৮. উন্নত সভ্যতার কোন সভ্যতায় দেখা গিয়েছিল?

৯. কুলপা কী?

১০. 'বিশ' বা 'জন' বলতে কী বোঝেন?

১১. হরপ্পা সভ্যতার মৃৎপাত্রগুলির রঙ কী ছিল?

১২. Proto-Historic Age বলতে কী বোঝেন?

১৩. ঘোড়ার অধিক প্রচলন কোন সভ্যতায় দেখা যায়?

১৪. সরস্বতী কী?

১৫. ইন্দো-আর্য ভাষা বা গোষ্ঠী-কোনটি ঠিক?

গ্রন্থপঞ্জী:

১. রোমিলা থাপার, ভারতবর্ষের ইতিহাস। (এই বই থেকে বেশীরভাগ সংগৃহীত)

২. A.L.Basham.-The Wonder that was India নামক গ্রন্থের বাংলা অনুবাদ। ভূমিকা ব্রতীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়, অনুবাদ আশুপতি দাশগুপ্ত।

৩. সুনীল চট্টোপাধ্যায়, প্রাচীন ভারতের ইতিহাস

৪. H.C.Roychowdhury, Political History of Ancient India, with an introduction by B.N.Mukherjee

৫. S.Ratnagar. The Harappa Civilization.

- Chalcolithic Age – ভারতে নব্য প্রস্তর যুগ ও ধাতুর যুগের মধ্যে কোনও সীমারেখা টানা সম্ভব হয়নি। এই সময় মানুষ তামা ও ব্রোঞ্জের ব্যবহারের সঙ্গে সঙ্গে পাথরের ব্যবহারও করতে থাকে। তাই এই যুগ 'তাম্র-প্রস্তর যুগ' (Chalcolithic Age)।
- হরপ্পা ও সিন্ধু সভ্যতার আবিষ্কারক – প্রথমটি দয়ারাম সাহানি এবং দ্বিতীয়টি রাখালদাস

বন্দ্যোপাধ্যায়।

- 'মহেঞ্জোদারো' – মৃতের স্তূপ।
- সিন্ধু সভ্যতার কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ নগর – মহেঞ্জোদারো, হরপ্পা, চানজদারো, কালিবঙ্গান, বানওয়ালি, লোথাল প্রভৃতি।
- সোক্‌পিট, ম্যানহোল – সিন্ধু বা হরপ্পা সভ্যতায় পরিলক্ষিত।
- মহেঞ্জোদারোয় – স্নানাগার (আয়তন দৈর্ঘ্যে ১৮০ ফুট ও প্রস্থ ১০ ফুট)।
- সিন্ধু সভ্যতার খাদ্য – গম, যব, কর্লি, ভাত, ফলমূল, তিল, মটর, দুধ, মাছ, ডিম, শাকসবজি, মুরগি, ভেড়া, গরু ও বিভিন্ন পাখির মাংস খাদ্য তালিকায় অন্তর্ভুক্ত ছিল।
- সিন্ধু সভ্যতার পশু – গরু, মহিষ, ভেড়া, উট, হাতি. ছাগল, বাঘ. বাইসন, গন্ডার প্রভৃতি।
- লোথাল – বিশ্বের প্রাচীনতম বন্দর ও পোতাশ্রয়।
- সিন্ধু সভ্যতার শ্রষ্টা – সুমেরীয়, দ্রাবিড়, আর্ম বা ব্রাদুউ, অসুর নান, পণি, ব্রাত্য, দাস প্রভৃতির কথাও বলা হয়।
- সিন্ধু লিপি – হরপ্পাবাসী ছবি এঁকে তাদের মনের ভাব প্রকাশ করত। এগুলিই হল 'সিন্ধু লিপি' বা 'হরপ্পা লিপি'। এই সব লিপি এখনও পাঠোদ্বার সম্ভব হয়নি।
- প্রথম ধান চাষ ও মুরগি পালনের সূত্রপাত – সিন্ধু উপত্যকায়।
- 'আত্মদেহসমুদ্ভবৈর' – দেবী দুর্গার অপর শাকম্ভরী অর্থাৎ যিনি 'আত্মদেহসমুদ্ভবৈর' (যিনি নিজ দেহ সমুদ্ভূত)।
- 'আর্য' – খাঁটি সংস্কৃত শব্দে 'আর্য' কথার অর্থ হল 'সৎবংশজাত' বা 'অভিজাত মানুষ'। প্রকৃত অর্থে 'আর্য' কোনও জাতিবাচক শব্দ নয় – 'আর্য' হল একটি ভাষাগত ধারণা।
- 'দেবনির্মিত দেশ' – সপ্তসিন্ধু অঞ্চল। (আর্যরা এই অঞ্চলকে 'দেবনির্মিত দেশ' বলে অভিহিত করত)।
- 'প্রাচী' – আনুমানিক ১৮০০ খ্রিষ্টপূর্বাব্দ থেকে ৮০০ খ্রিষ্টপূর্বাব্দের মধ্যে পূর্ব ভারতে আর্য আধিপত্য বিস্তৃত হয়। বৈদিক যুগে এই অঞ্চলটি 'প্রাচী' নামে পরিচিত ছিল।
- পরিবার – ঋকবৈদিক যুগে সমাজের সর্বনিম্ন স্তর।
- গ্রামণী – ঋগ্বেদে উল্লিখিত গ্রাম প্রধান।
- বশিষ্ঠ ও বিশ্বামিত্র – ঋক বৈদিক যুগের প্রভাবশালী পুরোহিত।
- 'বলি' – ঋক্ বৈদিক যুগে রাজার আয়ের উৎস ছিল 'বলি'। 'বলি' কোনও কর নয় – দান, প্রণামি বা উপহার।
- 'মধ্যমাসি' – ঋক বৈদিক যুগে পারস্পরিক বিবাদে যিনি মধ্যস্থতা করতেন।
- বৈদিক দেবতা – ইন্দ্র, বরুণ, অগ্নি, যম, বায়ু প্রভৃতি।
- সংগ্রহিত্রী – পরবর্তী বৈদিক যুগের কোষাধ্যক্ষ।

টিপ্পনী

টিপ্পনী

- ভাগদুখ – পরবর্তী বৈদিক যুগের কর আদায়কারী।
- বিতস্তা নদীর বর্তমান নাম – ঝিলাম।
- ঋগ্বেদে 'শুদ্র' শব্দের উল্লেখ – ১ বার।
- ঋক-বৈদিক দেবী – অদিতি, উণা, সাবিত্রী, সরস্বতী।
- ঋগ্বেদে উল্লিখিত বর্তমান বিলুপ্ত নদী – সরস্বতী।
- বৈদিক যুগ – সে সময় বৈদিক সাহিত্য অর্থাৎ সংহিতা, ব্রাহ্মণ, আরণ্যক, উপনিষদ ও সূত্রসাহিত্য রচিত হয়।
- বৈদিক সভ্যতার ভিত্তি – গ্রাম।
- 'সভা ও সমিতি' – ঋগ্বৈদিক যুগে দুটি গণপ্রতিনিধিত্বমূলক সংস্থা।
- আর্যদের অনুসন্ধান – রামশরণ শর্মা।
- The Vedic Age - Edi. R.C. Majumder.

পর্যায় ১.২. ভারতীয় শিল্প ও স্থাপত্যে মৌর্য, শুঙ্গ, পল্লব, চোল এবং মুঘল

একক ১.২.১. মৌর্যযুগের শিল্প ও স্থাপত্য

- সূচনা
- ঐতিহাসিকের দৃষ্টিতে বা তথ্যের আলোকে মৌর্য শিল্প ও স্থাপত্য
- শিল্প ও স্থাপত্য

একক ১.২.২. শুঙ্গ শিল্প ও স্থাপত্য

- সূচনা
- হিন্দুধর্মের উৎকর্ষতা
- শিল্প-স্থাপত্য ও দৃশ্যকলা
- প্রগতির ধারায় শিল্প-স্থাপত্যের উৎকর্ষতা
- নিজস্বতা
- বৈশিষ্ট্য

একক ১.২.৩. পল্লব যুগের শিল্প ও স্থাপত্য

- সূচনা
- শিল্প ও স্থাপত্য
- নতুন শৈলী
- উপসংহার

একক ১.২.৪. চোলযুগের শিল্প ও স্থাপত্য

- সূচনা
- শিল্প ও স্থাপত্য
- ভাস্কর্য
- চোল মন্দির

একক ১.২.৫. মুঘল যুগে শিল্প ও স্থাপত্য

- সূচনা
- বিবর্তনের ধারা
- মুঘলযুগে শিল্প ও স্থাপত্য

টিপ্পনী

• উপসংহার

১.২.১. মৌর্যযুগের শিল্প ও স্থাপত্য :

সুচনাঃ

ভারতবর্ষের ইতিহাস পর্যবেক্ষণ করলে সভ্যতার পরিণত সময়কালেই তার বহি:রঙ্গে শিল্প-সাহিত্যের নজির লক্ষ্য করা যায়। দৃষ্টান্ত স্বরূপ হরপ্পা বা সিন্ধুসভ্যতা হল সেই সভ্যতা যে কিনা সেই অধিকার অর্জন করেছে। কিন্তু প্রত্নতাত্ত্বিক খননকার্যের অপ্রতুল্যতাই সেই নিদর্শন সভ্যতার বহি:রঙ্গেই একেবারে মলিন হয়ে গেছে। যেটুকু আছে তুলনার নিরীখে একেবারেই যতসামান্য। তবে, এখনও আশাবাদী হওয়াও চলে নিত্য নিতুন খননকার্যে কিছু না কিছু উঠে আসবে। এদিক থেকে মৌর্যযুগ অধিক অগ্রসর। শিল্প-স্থাপত্যের যা কিছু ছিল সেসবই প্রায় উঠে এসেছে। ডি. ডি. কোশাম্বি বলেছেন, ''Indian art and arctitecture not the least valuable part of Indian Culture, may be side to begin from asoka inspite of Indus Valley Construction.''

ঐতিহাসিকের দৃষ্টিতে বা তথ্যের আলোকে মৌর্য শিল্প ও স্থাপত্য :

মেগাস্থিনিসের বর্ণনা থেকে জানা যায় চন্দ্রগুপ্তের মূল প্রাসাদটি ছিল কাঠের তৈরী। অর্থশাস্ত্রের ব্যাখ্যানুযায়ী কী দিয়ে এই প্রাসাদ নির্মিত হয়েছিল-একথা বলা দুষ্কর। তবে, অর্থশাস্ত্রের নির্দেশ ছিল যে, প্রাসাদ কাঠের তৈরী হলে ভালো হয়। মেগাস্থিনিসের বর্ণনা আছে, প্রাসাদের থামগুলিতে সোনা রূপার পাত লাগান এবং তার গায়ে সোনার তৈরী লতা ও রূপার পাখী খোদিত। তুলনায় অশোকের প্রাসাদ ছিল বিশালাকার এবং পাথরের তৈরী। আর এতে জাঁকজমক ও শিল্পশৈলী বিকাশের ক্ষেত্র ছিল একেবারেই কম। পাটনার কাছে কুমরাহারে অশোকের প্রাসাদের যে ধ্বংসাবশেষ পাওয়া গেছে তাতে দেখা যায় পাথরগুলি অসম্ভব মসৃণতায় আয়নার মত ঝক্‌ঝকে। ডঃ আর. সি. মজুমদারের মতে, ভারতীয় ভাস্কর্য ও স্থাপত্য শিল্পে পাথরের ব্যবহার আশোকের আমল থেকেই শুরু হয়।

শিল্প ও স্থাপত্য :

এই যুগের সমস্ত শিল্পকর্ম-স্থাপত্যই হোক বা ভাস্কর্যই হোক- বৌদ্ধধর্মকেই কেন্দ্র করে রচিত হয়েছিল। আর বৌদ্ধধর্মও একই সঙ্গে বিশ্বজনীন হয়ে উঠেছিল। ধনী ব্যবসায়ীর সমবায় সংঘের বা রাজকীয় অনুদানের সাহায্যে এইযুগের শিল্পকর্ম সফল হয়ে উঠেছিল। ধর্মীয় স্থাপত্যের নিদর্শন আজও দেখতে পাওয়া যায় বৌদ্ধস্তূপ ও গুহামন্দিরগুলির মধ্যে স্তূপের ঐতিহ্যের ইতিহাস লুকিয়ে বা গ্রথিত আছে প্রাচীনকালের সমাধি ক্ষেত্রগুলিতে। তারই অনুকরণে স্তূপের উৎপত্তি। বুদ্ধদেব বা কোন সম্মানিত বৌদ্ধভিক্ষুর দেহাবশেষকে কেন্দ্র করেই গোলাকৃতি স্তূপগুলি তৈরী করা হোত। আর কেন্দ্রে একটি ছোট ঘরে পাত্রস্থিত দেহাবশেষ রাখা হত। স্তূপের চারিদিকে ঘিরে থাকত বেড়া দেওয়া পথ। এই পথের চারকোণে চারটি তোরণ থাকত। কলকাতার যাদুঘরে সংরক্ষিত ভারতের সর্ববৃহৎ বেড়াটি আজও দেখতে পাওয়া যায়। এটি তৈরী হয়েছিল খ্রীষ্টপূর্ব দ্বিতীয় শতকে। সাঁচীর বিখ্যাত স্তূপটি এই যুগে পুন:নির্মিত হয়েছিল। প্রবাদ আছে যে, অশোক মোট ৮৪(চুরাশি) হাজার স্তূপ নির্মাণ করেছিলেন আজীবিক ও বৌদ্ধভিক্ষুদের জন্য। কোশাম্বী বলেছেন, সাঁচীর স্তূপ ও তোরণ অশোকের পরে তৈরী হলেও তাতে মৌর্যশিল্পের প্রভাব রয়েছে।

স্তূপ নির্মাণে স্থপতিদের পক্ষে তেমন কোন শিল্প চাতুর্য দেখানোর সুযোগ থাকত না।

টিপ্পনী

কারণ তাদের কাঠের তোরণের অনুরূপ স্তূপের তোরণ নির্মাণ করতে হত। গুহামন্দির নির্মাণের ক্ষেত্রেও দেখা গেছে কাঠের তৈরী মন্দিরগুলিকে আদর্শ বলে ধরা হয়েছে। পাহাড়ের গায়ে গায়ে কাটা গুহাগুলিতে ভিক্ষুরা উপাসনা করত। স্তূপের মধ্যে যা যা থাকে, গুহাগুলির মধ্যেও সেসব রাখার চেষ্টা হত। এইভাবেই বড় বড় মন্দিরগুহাগুলি তৈরী করা হয়েছিল। এর কয়েকটি রয়েছে দাক্ষিণাত্যের পশ্চিমাঞ্চলে, বিশেষত: কার্লে অঞ্চলে। পাহাড় কেটেও এইসব জটিল আকৃতির গুহামন্দির তৈরী হয়েছে। গুহার প্রবেশদ্বার ছিল আয়তক্ষেত্র ধরনের। প্রথমে উপাসনা গৃহ-এটিও আয়তক্ষেত্রকার। ওই ঘরের একপ্রান্তে স্তূপটির ছোট একটি প্রতিরূপ রাখা থাকত। আর থাকত গুহার দুইপাশ বরাবর ভিক্ষুদের থাকবার ছোট ছোট ঘর। প্রাচীন অজন্তা, ইলোরা কিংবা পরবর্তীকালে অন্যান্য হিন্দু মন্দিরের চেয়ে বৌদ্ধগুহা মন্দিরগুলির পরিকল্পনাও বেশী সুন্দর, স্থাপত্যও বেশী শিল্পসমৃদ্ধ। এছাড়া, অশোকস্তম্ভ, সারনাথস্তম্ভ ও মৃৎশিল্পের শিল্পসুষমার ছিল নানা ধরণ- যা কিনা শিল্পসত্ত্বার ঊর্ধ্ব পর্যায়।

টিপ্পনী

১.২.২. <u>শুঙ্গ শিল্প ও স্থাপত্য</u> :

<u>সূচনা</u>:

মগধকে কেন্দ্র করে শুঙ্গ রাজবংশের ইতিহাস আনুমানিক খ্রিষ্টপূর্ব ১৮৫ থেকে খ্রিষ্টপূর্ব ৭৩ পর্যন্ত বিস্তার লাভ করেছিল। প্রথমের দিকে শুঙ্গ শাসকদের রাজধানী ছিল পাটলিপুত্র। কিন্তু তাঁরা ধীরে ধীরে উত্তর-মধ্য এবং পূর্বদিকে নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠা করতে সম্ভবপর হয়ে উঠেছিল। মৌর্যযুগের পর বিশেষত মৌর্য সম্রাট বৃহদ্রথকে নিহত করে মগধের সিংহাসনে বসেছিলেন পুষ্যমিত্র শুঙ্গ। এই সময়ে ভারতের রাজনৈতিক অবস্থা সম্পর্কে জানতে সাহায্য করে যুগ পুরাণ, পতঞ্জলির মহাভাষ্য, বাণের হর্ষচরিত, কালিদাসের কুমারসম্ভবম্ এবং বৌদ্ধ সাহিত্য দিব্যবদান প্রভৃতি। এছাড়া, ভারহূত, সাঁচী, অযোদ্ধা, নাসিক, হাতীগুম্ফা প্রভৃতি স্থানের প্রত্নতাত্ত্বিক নিদর্শনগুলি থেকেও বহু তথ্য জানতে পারা যায়।

<u>হিন্দুধর্মের উৎকর্ষতা</u> :

শুঙ্গ শাসনকালেই ধর্মীয় দিকটির উৎকর্ষ ফুটে উঠেছে। হিন্দু দর্শনের (School of thought) মধ্য থেকে পতঞ্জলির যোগের ধারাবাহিকতা উঠে এসেছে। সেই ধারা সম্প্রতিও অক্ষুন্ন রয়েছে। ভাগবৎ গীতার কথাও একইভাবে উঠে আসে। বর্তমানেও তার গুরুত্ব অনস্বীকার্য। বৌদ্ধধর্মের পরবর্তী যে ধারা তাতে হিন্দুভাবনার যে আধিক্য উঠে এসেছে তাতে শুঙ্গ রাজবংশের অবদান কম ছিল না।

<u>শিল্প-স্থাপত্য ও দৃশ্যকলা</u> :

শুঙ্গশাসনের অবদানের দিকটিতে শুধু শিল্প-স্থাপত্যের নজিরে বদ্ধ হয়ে ওঠেনি; দর্শন, শিক্ষা ও শেখার উন্নতির ধারাবাহিকতাও উঠে এসেছে। পতঞ্জলি তাঁর ছাত্রদের ব্যাকরণে অসমাপিকা ক্রিয়া বুঝাবার জন্য "অরুদ্ধ-যবনঃ সাকেতাম", "অরুদ্ধ-যবনঃ মাধ্যমিকাম" এখনও উদাহরণ দিয়েছিলেন।

শুঙ্গ শাসনকালে দৃশ্যকলার প্রস্ফুটিত রূপটি উঠে এসেছে। ছোট ছোট পোড়ামাটির কারু চিত্র, বৃহৎ পাথর স্থাপত্যকে আলোচিত করে তুলেছিল। স্থাপত্যের ক্ষেত্রে চৈত ও স্তূপ উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত আজও বহন করে চলেছে। শুঙ্গ যুগের স্থাপত্য ও ভাস্কর্যকলা ছিল মৌর্য যুগ হতে স্বতন্ত্র। শুঙ্গ স্থাপত্যে কাঠের ব্যবহার করা হত না। মৌর্য যুগের স্তূপগুলিতে কাঠের বেষ্টনীর

স্থলে শুঙ্গযুগে পাথরের তৈরী বেষ্টনী ও তোরণের চলন দেখা যায়। বিদিশা ছিল শুঙ্গ শিল্পকলার প্রধানতম কেন্দ্র। ফুশার (foucher) এর মতে ''বিদিশার গজদন্তের শিল্পীরাই সাঁচীর তোরণ খোদাই করে।'' এছাড়া ভারহুত, অমরাবতী স্তূপ, পুনার নিকটে পাহাড় খোদাই করা বিহার, বিদিশার গরুড় স্তম্ভ প্রভৃতি শুঙ্গ শিল্পকলার নিদর্শন বলে গণ্য করা হয়।

শুঙ্গযুগে ভাগবত ধর্ম বা বৈষ্ণব ধর্মের বিশেষ জনপ্রিয়তা বাড়ে। সাধারণ লোকের মধ্যে বিষ্ণুর উপাসনা ব্যাপক হয়। কিন্তু অশোকের মতো কোন পৃষ্ঠপোষক না থাকায় ভাগবত ধর্ম প্রবলভাবে ছড়িয়ে পড়তে পারেনি। তবে যবন বা ব্যাকট্রীয়দের মধ্যে ভাগবত ধর্মের প্রসার ঘটেছিল। বিদিশায় কাশীপুত্র ভাগভদ্রের রাজসভায় গ্রীকদূত হেলিওডোরাস নিজেকে ''পরমবৈষ্ণব'' বলে দাবী করেন। সেটি প্রসঙ্গত বলার তা হল- তিনিই বিষ্ণুর উদ্দেশ্যে একটি গরুড় স্তম্ভ নির্মান করেন।

টিপ্পনী

প্রগতির ধারায় শিল্প-স্থাপত্যের উৎকর্ষতা:

শিল্পের উন্নতির মধ্য দিয়েই সেই ধারাবাহিকতা অক্ষুন্ন রেখে মথুরা শিল্পের চরম বিকাশ লক্ষ্য করা যায়। গান্ধার শিল্পও এর ব্যতিক্রম নয়। গান্ধার শিল্পে গ্রীক ও ভারতীয় রীতির মিশ্রণে বুদ্ধমূর্তি তৈরী করা হত। গান্ধার শিল্পরীতির পাশাপাশি ব্যাকট্রিয় শিল্পরীতির যে উদ্ভব ঘটেছিল তাও সেই ধারাকে অক্ষুন্ন রেখেছে।

নিজস্বতা:

এন.আর.রায়ের মতে, মৌর্যশিল্পকল্প একান্তভাবে এলিট এবং রাজদরবার কেন্দ্রিক কিন্তু শুঙ্গ শিল্পে এসবের স্থান ছিল না, সম্পূর্ণভাবেই তা ফোক (Folk) শিল্পকলা। এর মধ্যে বৌদ্ধভাবাদর্শ, হরপ্পা শিল্পকলার মূলধারা ও তাদের নিজস্বতার দিকটিও পরিলক্ষিত হয়।

বৈশিষ্ট্য:

শুঙ্গ-কান্ব শিল্পকলার প্রধানতম বৈশিষ্ট্য চৈত্য (Chaitya). স্থাপত্য। মহারাষ্ট্রের পশ্চিমঘাট অঞ্চলে এজাতীয় নিদর্শন প্রবক্ষ করা যায়। এছাড়া ইতিপূর্বে আলোচিত কয়েকটি স্তূপের কথা বলা হয়েছে। শুঙ্গযুগেই সূচিত হয় ভাস্কর্যের নানান রূপ। খন্ডগিরি, উদয়গিরি, কার্লে চৈত্যের মধ্যে ভাস্কর্যের যে চিত্রকলা ফুটে উঠেছে-তা পরবর্তীকালের শিল্প ও স্থাপত্যের চরম উৎকৃষ্টতার সাক্ষ্যবহন করে।

১.২.৩. পল্লব যুগের শিল্প ও স্থাপত্য :

সূচনা:

দক্ষিণ ভারতের শিল্প স্থাপত্যের ইতিহাস পল্লব আমলের মন্দিরগুলি থেকেই সূচিত হয়েছিল। ব্রাহ্মণদের আশ্রয়ে প্রতিষ্ঠিত ধর্মের অর্থ বা পৃষ্ঠপোষকতার অভাব কোনটাই ঘটেনি। স্থানীয় মন্দির ছিল সর্ব ধর্ম চর্চার কেন্দ্র এবং স্থানীয় মন্দিরই ছিল ব্রাহ্মণ্যবাদ ও ভক্তিবাদের মিলনস্থল। আর্যসংস্কৃতি ও দ্রাবিড় সংস্কৃতির সংমিশ্রণে গড়ে ওঠা পল্লব শিল্প-সংস্কৃতি দক্ষিণ ভারতীয় সাংস্কৃতিক ক্ষেত্রে এক বিশেষ অবদান রেখেছিল। পল্লব যুগের মন্দিরগুলিতে দ্রাবিড় শিল্পরীতির প্রথম পরিচয় লক্ষ্য করা যায়। দ্রাবিড় শিল্পরীতির বৈশিষ্ট্যগুলি মাথায় রাখলে জানা যায় এই মন্দিরগুলির প্রধান বৈশিষ্ট্য হল বিমানের পিরামিডের মতো উচ্চতা। এই বিমান বহুতল

এর প্রতিটি তল গর্ভগৃহের অনুরূপ এবং নীচের তলের তুলনায় অপেক্ষাকৃত ক্ষুদ্র। এর শীর্ষদেশ গম্বুজাকৃতি, শিল্পশাস্ত্রের পরিভাষায় যা স্তূপ বা স্তূপিকা নামে পরিচিত। আর, এই মন্দিরের অভ্যন্তরে একটি চতুষ্কোণ গর্ভগৃহ রয়েছে যাকে ঘিরে রয়েছে একটি বৃহত্তর চতুষ্কোণ আচ্ছাদিত বৈষ্টনী, যাকে বলা হয়ে থাকে 'প্রদক্ষিণ'। মন্দিরের বাইরের দেওয়ালে, আয়তাকার স্তম্ভ দ্বারা কতকগুলি কুলুঙ্গী তৈরী করা হত। চৈত্য-বাতায়নসহ উত্তল বেলনাকার কার্নিস এবং উপরের তলগুলিকে ঘিরে ছিল সঙ্কীর্ণ অলিন্দ। কিন্তু পল্লবযুগের শেষের দিকে নির্মিত মন্দিরগুলিতে স্তম্ভযুক্ত হল ঘর, বিভিন্ন অংশের মধ্যেকার সংযোগস্থাপক পথ ও বৃহৎ আকৃতির তোড়ণ লক্ষ্য করা যায়। আর তামিল সাধকরা ধর্মীয় সংগীত ও স্তবগান জনপ্রিয় করে তুলেছিলেন। স্তবগান মন্দিরের নিয়মিত অনুষ্ঠান হয়ে দাঁড়াল-শিল্প-সথাপত্যে সে যেন এক আত্ম-প্রতিধ্বনি উদ্ভাসিত হতে থাকল।

টিপ্পনী

<u>শিল্প ও স্থাপত্য</u> :

অতীত্রে ঐতিহ্য থেকে পল্লবশিল্পীর শিল্প সৃষ্টিতে অবদান রেখেছিলেন। তবে, সেই ঐতিহ্যের উপাদান কাঠ বা অন্যান্য বিনাশশীল দ্রব্য খুব একটা দীর্ঘমেয়াদ ঘটেনি। আর সেই কারণেই সেগুলি আর পাওয়া যায় না। তবে শুরুর দিকে এই মন্দিরগুলিতে দারুশিল্পের চিহ্ন পাওয়া গেছে। যাহোক, পল্লবযুগে পাহাড় কাটা মন্দির এবং স্বাধীন স্বতন্ত্র মন্দিরগুলির মধ্যে যোগসূত্র স্থাপনের পরিচয় মেলে। প্রথম পর্বের মন্দিরগুলিকে আবার দুইটি শ্রেণীতে বিভক্ত করা যায়। স্থাপত্যরীতিতে এদুটি- স্তম্ভযুক্ত ও রথমন্দির। শিলা দ্বারা নির্মিত রথমন্দিরগুলির আকৃতি একএকটা বিরাট পর্যায়ের আর দ্বিতীয় শ্রেণীভুক্ত মন্দিরগুলির মন্ডপ ছিল প্রথমটির তুলনায় ব্যপকতর। প্রথমটির ক্ষেত্রে দেখা যায় পাহাড় কেটে গুহা তৈরী হত এবং ত্রিকোণ বা গোলাকার স্তম্ভ দিয়ে মন্দিরের ছাদটিকে ধরে রাখা হত। এটি 'মহেন্দ্ররীতি' নামে পরিচিত। কারণ পল্লবরাজ প্রথম মহেন্দ্রবর্মন-এর রাজত্বকালেই এই মন্দিররীতি নির্মাণ করা হয়েছিল। ত্রিচিনোপল্লি, চেঙ্গলপেট এবং আর্কট জেলায় এই ধরনের মন্দিরের নিদর্শন পাওয়া যায়। তবে, পরবর্তীকালে মন্দিররীতিতে যে পরিবর্তন আসে তাতে দেখা যায় মন্দিরগুলি ক্রমশ বড় হচ্ছে এবং স্তম্ভগুলির অলঙ্করণও উন্নততর হয়ে চলেছে। পাহাড় কেটে একটি প্রস্তর-খন্ডে রথের আকৃতিতে যে মন্দির তা 'মামল্ল' বা 'মহামল্ল' রীতি নামে পরিচিত। চেন্নাই শহরে মামল্লপুরমে এ ধরনের সাতটি রথ বা রথমন্দির পাওয়া গেছে। এই রথগুলি পঞ্চপান্ডব এবং দ্রৌপদী ও গণেশের নামাঙ্কিত। এগুলিকে একত্রে 'সপ্তপ্যাগোডা' বলা হয়। তবে সব রথের আয়তন মোটামুটি একই আয়তনের হলেও সর্ববৃহৎ রথটির শিল্পরীতি একশিলা বা রথশৈলীর আওতায় পড়েছে। মহামল্লরীতির দ্বিতীয় ক্ষেত্রটিতে পাহাড় খোদাই করে মন্ডপ বা গুহা নির্মাণের কার্য ধরা পড়েছে। মামল্লপুরামে এ ধরনের সতেরোটি গুহামন্দির নির্মিত হয়। এগুলির মধ্যে মহিষমর্দিনী, আদিবরাহ, বরাহ, ত্রিমূর্তি প্রভৃতি উল্লেখযোগ্য। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, পল্লবযুগের পাহাড়কাটা মন্দিরগুলি বৌদ্ধ গুহামন্দিরগুলির সমতুল্য। অপরদিকে পাথরের উপর পাথর সাজিয়ে স্বাধীন এ স্বতন্ত্র মন্দির নির্মাণ শুরু হয়েছিল রাজসিংহ ও নন্দীবর্মনের আমলে। তির মন্দির, ইশ্বর মন্দির, মুকুন্দ মন্দির, মুক্তেশ্বর মতঙ্গেশ্বের মন্দির-এগুলি তারই দৃষ্টান্ত।

<u>নতুন শৈলী</u> :

পল্লব শিল্প ধীরে ধীরে দারুশিল্প ও গুহাস্থাপত্যের প্রভাব থেকে মুক্তিলাভ করে নতুন শৈলী গ্রহণ করেছিল তার প্রমাণ উপরোক্ত মন্দির শিল্পগুলিতে পাওয়া যায়। এবং পল্লব শিল্পরীতিকে রাজাদের নামানুসারে চারটি পৃথক রীতিতেও ভাগ করা হয়েছে। উপরে আলোচিত মহেন্দ্র রীতি, নরসিংহ বর্মন রীতি ও রাজসিংহ রীতিতে সেকথাই প্রতীয়মান হয়। অপরাজিত পল্লবের হাতে গড়ে ওঠা সর্বশেষটি হল অপরাজিত রীতি। যার সঙ্গে চোল স্থাপত্য রীতির

সাদৃশ্য দেখা যায়।

টিপ্পনী

উপসংহার :

খ্রিষ্টীয় ষষ্ঠ শতকের শেষভাগে পল্লব রাজবংশের অধীনেই দক্ষিণ ভারতীয় স্থাপত্য ও ভাস্কর্যের ইতিহাসের সূত্রপাত হয়।[১] কাঞ্চীর পল্লব রাজাদের স্থাপত্যরীতি ও স্থাপত্যকীর্তি দক্ষিণ ভারতেই শুধুমাত্র সীমাবদ্ধ ছিল না। শ্রীলঙ্কা, জাভা, আনাম ও কম্বোডিয়া ইত্যাদি অঞ্চলের স্থাপত্যরীতিতে পল্লব স্থাপত্য শিল্পের যথেষ্ট প্রভাব লক্ষ্য করা যায়। শিল্প বিশেষজ্ঞ গ্রোসেট(Grousset) বলেছেন, পল্লব-শিল্পীরা শিল্পকর্মে এক নতুন রীতির বিকাশ ঘটান, যার উপর ভিত্তি করেই দক্ষিণ ভারতের অপরাপর শিল্পরীতি গড়ে ওঠে।[২] তথাপি, স্থাপত্য ও শিল্পচর্চার ক্ষেত্রে কাঞ্চীর পল্লব রাজারা দক্ষিণ ভারতীয় সংস্কৃতির ইতিহাসকে অত্যন্ত গৌরবান্বিত করে তুলেছে।একইসঙ্গে, ভারতবর্ষের শিল্পচর্চার ইতিহাসে পল্লব শিল্প-স্থাপত্য এক গুরুত্বপূর্ণ আসন অধিকার করে রয়েছে। ঐতিহাসিক ভি.এ.স্মিথ লিখেছেন, ‘‘The pallava school of architecture and sculpture is one of the most important and interesting of the Indian Schools”-The Oxford History of India,English, P, 223.

* ১. “.......... the history of Indian artitecture and sculpture in the south begins at the close of sixth century under the pallava rule.”-The Oxford History of India, Smith, P-223.”

* ২. “.......... Created an arctitecture of their own which was to be the basis of all the styles of the south.”

১.২.৪. চোলযুগের শিল্প ও স্থাপত্য :

সূচনাঃ

মুক্তির প্রধান উপায় হল জ্ঞান-শঙ্করের এই অভিমতকে রামানুজ মানেননি।রামানুজের মতে জ্ঞান হল মুক্তির নানা পথের একটিমাত্র পথ। এর চেয়েও গুরুত্বপূর্ণ পথ হল গভীর ভক্তি-ঈশ্বরের কাছে সম্পূর্ণ আত্মসমর্পণ।আর এর জন্যই উপমহাদেশের বিভিন্ন হিন্দু ধর্মকেন্দ্র ও শিক্ষাকেন্দ্র খুবই প্রয়োজনীয় হয়ে পড়ল। দেশের বিভিন্ন মঠ ও শিল্পকেন্দ্রে ধর্ম সম্পর্কে বিতর্ক সভা বসত। তাদের পারস্পরিক চিন্তা বিনিময়ের ভাষা ছিল সংস্কৃত। আর আগের যুগ থেকেই মন্দির ছিল সংস্কৃত শিক্ষার কেন্দ্র।তথাপি ধর্মের সঙ্গে শিল্প-স্থাপত্যের যোগসূত্র নিবিড়। এরূপ, প্রেক্ষাপটে পল্লব স্থাপত্য রীতির সঙ্গে চোল স্থাপত্য রীতির আন্ত:সম্পর্ক ঘনিষ্ঠ হয়ে উঠল। দেখা যায়, পল্লবরা দক্ষিণভারতে যে শিল্পরীতির সূচনা ঘটিয়েছিলেন চোলদের আমলে এসে সেই দ্রাবিড় শিল্পরীতির পূর্ণতা ঘটে।

শিল্প ও স্থাপত্য:

চোলযুগে পাহাড়কাটা মন্দিরের চেয়ে সমতল জমির ওপর খাড়া মন্দির নির্মাণের ঝোঁক বেশী দেখা দিল। দুর্ভাগ্যক্রমে ওই যুগের বাড়ি ঘর বা দালানগুলি আজ আর টিকে নেই; তবে মন্দিরগুলি আছে। মন্দিরের গর্ভগৃহ নির্মাণের ওপর চোলরা বেশি গুরুত্ব দিত। এক বা একাধিক হলঘর এমনভাবে নির্মাণ করা হয়েছিল যাতে তার মধ্যে থেকে গর্ভগৃহে পৌঁছানো যায়। গর্ভগৃহের বাইরে ওপরের দিকে উঁচু পিরামিড আকৃতির শিখর নির্মাণ করা হতো। শিখরের উচ্চতা ঠিক মন্দিরের আয়তনের অনুপাতেই করা হয়েছিল। মন্দিরের চারিদিকে দেওয়াল বেষ্টিত প্রাঙ্গন থাকত। আর এই দেওয়ালের ভিতরদিকে নির্দিষ্ট দূরত্বে সারিবদ্ধ থাম থাকত। চোল স্থাপত্য শিল্পের ইতিহাসে চোলরাজ রাজরাজ চোল এবং তাঁর পুত্র রাজেন্দ্র চোল উল্লেখযোগ্য স্থানের অধিকারী। রাজরাজ চোল কর্তৃক নির্মিত তাঞ্জোরের এই বৃহদীশ্বর বা রাজরাজেশ্বর মন্দিরটি হল দ্রাবিড় রীতির শ্রেষ্ঠ নিদর্শন। রাজেন্দ্র চোল তাঁর নতুন রাজধানী সঙ্গাইকোন্ড চোলপুরমে এক বিশালাকার শিবমন্দিরও নির্মাণ করেন। এদুটিতে প্রবেশদ্বারগুলির নির্মাণে ও গর্ভগৃহের শিখর নির্মাণের ধাঁচ অনুসরণ করা হয়েছিল। এছাড়া, উভয় মন্দিরই ছিল সূক্ষ্ম কারুকার্য-শোভিত, অলঙ্কার বহুল ও জাঁকজমকপূর্ণ।

উপরিউক্ত মন্দির দু'টি পল্লব প্রভাব মুক্ত হয়ে দ্রাবিড় স্থাপত্যের উজ্জ্বল নিদর্শনে পরিণত হয় ঠিকই কিন্তু প্রথম দিকে সে রেশ থেকে গিয়েছিল। এগুলির মধ্যে উল্লেখযোগ্য হিসাবে উঠে আসে চোল নৃপতি বিজয়ালয় প্রতিষ্ঠিত চোলেশ্বর মন্দির এবং প্রথম পরান্তক প্রতিষ্ঠিত করঙ্গনাথের মন্দির। প্রথম মন্দিরটির স্তম্ভযুক্ত মন্ডপ, তলযুক্ত শিখরদেশ এবং স্তূপিকা-যা কিনা পল্লব ঐতিহ্যের কথা স্মরণ করিয়ে দেয়। করঙ্গনাথের মন্দিরটি এই পর্বের শ্রেষ্ঠ স্থাপত্য নিদর্শন। এই মন্দিরের উপাসনাগৃহ এবং মন্ডপ পল্লব শিল্পের অনুসারী হলেও, এর স্তম্ভগুলি আকারে ও পরিকল্পনায় ছিল একেবারেই নতুন। এই পরিবর্তনের মধ্যে থেকেই আসে চোলদের শিল্প-স্থাপত্যে নিজস্বতা-বিশেষত দ্রাবিড় ফুটে ওঠে দ্রাবিড় স্থাপত্যের উজ্জ্বলতা।

ভাস্কর্য :

আবার কিছু কিছু ভাস্কর্যের মধ্যেও স্থাপত্যের বৈশিষ্ট্য লক্ষ্য করা যায়। মূল মন্দিরের মতো ভাস্কর্যও বিরাট আকৃতি নিল। স্তম্ভের শীর্ষদেশ ও স্তম্ভের অলংকরণের জন্য ভাস্কর্যের ব্যবহার মতো। চোলযুগের বিশেষত ব্রোঞ্জ ভাস্কর্যের কারিগরেরা এ বিষয়ে বেশী উৎকর্ষ দেখিয়েছে। এখানকার মূর্তিগুলির সঙ্গে পৃথিবীর যেকোনো ভাস্কর্য তুলনীয়। জানা যায়, দেবতা, দাতা ও সন্ন্যাসীদের মূর্তি ছিল এগুলি। ব্রোঞ্জ মূর্তিগুলি তৈরী হতো cire perdu, অর্থাৎ 'লুপ্ত মোম' পদ্ধতিতে। মূর্তিগুলি মন্দিরের ভিতরের অংশে রাখা হত। দক্ষিণভারতে ভাস্করদের প্রতিভা উদ্ঘাটনে এই মূর্তিগুলি আজও আলোকোজ্জ্বল ভূমিকা গ্রহণ করে চলেছে।

চোল মন্দির :

চোল মন্দিরগুলি ছিল নগরের লোকের সামাজিক মেলামেশা, উৎসব, আনন্দ ও ভ্রমণের স্থান। এগুলিতে যেমন একদিকে আধু-সন্ন্যাসীরা ধ্যান ও পূজোয় রত থাকতেন বা ধর্মীয় আলোচনাসভার আসর বসত তেমন নৃত্য, কথকতা, অভিনয় প্রভৃতি মন্দির প্রাঙ্গনেই সম্পন্ন হত। আর এজন্যই নগরের কেন্দ্রে থাকত মন্দির, প্রধানত: শিব মন্দির-যা ছিল বিরাট। কোন স্থাপত্য শিল্পের এক অন্যতম বৈশিষ্ট্য ছিল এর বিরাটত্ব। শিল্পবিশেষজ্ঞ ফার্গুসন বলেছেন, "The Chole artists conceived like giants and finished like jewellers."

টিপ্পনী

১.২.৫. মুঘল যুগে শিল্প ও স্থাপত্য :

টিপ্পনী

সূচনা:

মুঘল যুগ শিল্প ও স্থাপত্যের ইতিহাসে আজও এক বিশিষ্ট স্থান অধিকার করে আছে। এতদ্‌সত্ত্বে, এযুগের নিজস্ব শিল্পরীতি ছিল কিনা তা নিয়ে শিল্পবিশেষজ্ঞ বা ইতিহাসবিদদের মধ্যে বাদানুবাদ রয়েছে। ফার্গুসন (Fergusson) মোঘল স্থাপত্যে বৈদেশিক প্রভাব উল্লেখ করেছেন। জন মার্শাল-এর (John Marshall) মতে ভারতীয় স্থাপত্যে কোনো একটি বিশেষ ধরনের রীতি ছিল না। এমতাবস্থায়, মুঘল শিল্প-স্থাপত্যের সারসত্ত্বা কি ছিল তা জানতে গেলে তার যুগধর্মকে বুঝতে হবে।

বিবর্তনের ধারা :

ইসলামের চলমানতার ইতিহাস ঘাটলে দেখা যায় মুসলিম সৈন্যবাহিনী এসেছিল পারস্য, সিরিয়া ও ইজিপ্ট থেকে। স্বভাবতই তাদের মধ্যে এশীয় শিল্প ও সংস্কৃতি দৃঢ়মূল থাকায় তারা সর্বত্র একটি সমন্বিত ঐস্লামিক সংস্কৃতির জন্ম দিয়েছিল। অধ্যাপক পার্সি ব্রাউন মনে করেন যে রক্ষণশীলতা এবং ইসলামের সামাজিকীকরণের মধ্যে ইসলামীয় সংস্কৃতি বিপুল রক্তপাতের পটভূমিতে স্থায়িত্ব লাভ করেছিল। আর ভারতে যে ইসলামীয় শিল্প গড়ে উঠল তার মধ্যে হিন্দু প্রভাব স্পষ্ট হওয়ায় সেই শিল্পরীতিতে নৈর্ব্যক্তিক শিল্প জন্ম নিল। ঠিক একই রকম মুঘলদের ভারতীয়করণ ছিল বলে মুঘল শিল্পরীতি বলে স্বতন্ত্র কোনো রীতি দেখা যায়নি, সবটাই ছিল ভারতীয়। শিল্পরসিক ফার্গুসেনের অনুসরণে বলা যায় পৃথিবীর কোথাও কোনো শিল্পরীতি একান্ত মৌলিক বলে দাবী করতে পারে না। শিল্প সৌন্দর্যবোধ উদার বলেই সে অন্য রীতির দ্বারা প্রভাবিত হয়।

মুঘলযুগে শিল্প ও স্থাপত্য:

মুঘলযুগে স্থাপত্যের প্রথম লক্ষণ হল পাথর কেটে প্রাসাদ তৈরীর প্রয়াস। এছাড়া স্থাপত্যের প্রাথমিক নিদর্শন হিসাবে উঠে আসে পানিপথের কাবুল রাগ মসজিদ ও সম্বলের জামা মসজিদ। আর পাওয়া যায় অসমাপ্ত দীনপানা নগরী। কিন্তু কালানুক্রমিক বিচারে সাসারামের ৫ টি সমাধি-সৌধ, পুরান কিল্লা ও কুইলা-ই-কুষণা মসজিদ ও বিশেষ দাবী রাখতে পারে। জাহাঙ্গীরের সময়ে ইন্দো-ইসলামীয় এবং রাজপুত সংমিশ্রণ প্রসারিত হয়েছিল। সিকান্দার কাজ জাহাঙ্গীর সম্পন্ন করেন। তাঁর সময়েই প্রস্তরীভূত শিল্পকর্ম থেকে শ্বেতপাথরের শিল্পকর্ম অধিক জনপ্রিয় হয়। কিন্তু একথা ভুললে চলবে না যে আকবরের আমল থেকেই ইন্দো-পারসিক রীতির মিশ্রণে স্থাপত্যের বিশেষ বিকাশ লক্ষ্য করা যায়। হুমায়ুনের সমাধি, ফতেপুর সিক্রির সৌধ, বুলান্দ দরওয়াজা, জামা মসজিদ, বীরবলের গৃহ, মানসিংহের গৃহ, পাঁচমহল, খাসবাগ, দেওয়ান-ই-খাস বা আগ্রা দুর্গ প্রভৃতিতে পারসিক বা সমন্বয়ী স্থাপত্য ক্ষেত্রর সাক্ষ্যবহন করে চলেছে। ফতেপুরসিক্রী সম্পর্কে লেনপুল (Lanepool) মন্তব্য করেছেন, ‘‘Nothing Sadder are more beautiful exist in India than deserted city, the silent witness of a vanished dream.” আর এভাবেই ঘটেছিল মুঘল শিল্পরীতির ভারতীয়করণ।

নিঃসন্দেহে শাহজাহানের রাজত্বকাল মুঘল শিল্পের স্বর্ণযুগ। তাঁর নির্মিত স্থাপত্যে আলঙ্কারিক কারুকার্য ও চিত্রাঙ্কণের এক অপূর্ব সমন্বয় দেখা যায়। আগ্রা, দিল্লী, লাহোর, কাবুল, কাশ্মীর প্রভৃতি সর্বস্থানেই তিনি প্রাসাদ ও সৌধ নির্মাণ করেন। এগুলির মধ্যে দিল্লীর দেওয়ান-ই-আম, দেওয়ান-ই-খাস, জামা মসজিদ, মতি মসজিদ এবং আগ্রার তাজমহল সর্বশ্রেষ্ঠ। বিখ্যাত সমালোচক ফার্গুসন তাজমহল সম্পর্কে মন্তব্য করেছেন যে, ‘‘ এই সৌধ

ছিল বিভিন্ন প্রকার সৌন্দর্যের সমন্বয় এবং এরূপ নিপুণভাবে একটি সৌন্দর্য অপরটির সঙ্গে যুক্ত হয় যে, সমগ্র সৌধটি মহিমায় উপনীত হয়, যার তুলনা পৃথিবীতে নেই যা স্থাপত্য শিল্প সম্পর্কে উদাসীন ব্যক্তিকেও সচকিত করে।'' এছাড়া, তাজমহলকে ''দাম্পত্য প্রেমের এক অপূর্ব নিদর্শন'' বলে বর্ণনা করা হয়েছে। তাজ সম্পর্কে স্যার এডউইন আর্নল্ড-এর (Sir Edwin Arnold) মন্তব্য প্রণিধানযোগ্য।

> "Not architecture,
> as all others are,
> But the proud passion of an
> Empemor's love"

ঔরঙ্গজেবের আমলেও লাহোরে বাদশাহী মসজিদ, বারাণসীর সমজিদ ও দিল্লীতে একটি অনাড়ম্বর মসজিদ নির্মিত হয়। এছাড়া, তিনি পত্নী রাবিয়া-উদ-দূরাণীর স্মৃতিতে তাজমহলের অনুকরণে একটি সমাধি সেটি নির্মাণ করেন। যদিও এটি ছিল তাঁর ব্যর্থ প্রয়াস।

মুঘলরা নির্মাতা রূপে খ্যাতিমান ছিল। একদিকে যেমন বিশালাকার প্রাসাদ, মসজিদ, সমাধিস্থল নির্মিত হয়েছিল অপরদিকে তেমনি চিত্রকলা বা নৃত্যকলাতে সুখ্যাতি অর্জন করেছিল। এছাড়া, ছিল লোকশিল্প ও ক্যাংড়া শিল্প। বহু শতাব্দী পর আজও এসব মুঘলদের গৌরবের ঐতিহ্য বহন করে চলেছে। মোঘল সম্রাটরা ভারতে চৈনিক চিত্র-শিল্পের প্রবর্তন করেন এবং আকবরের দরবারে চৈনিক চিত্র-শিল্পের সঙ্গে হিন্দু চিত্র-শিল্পের সংমিশ্রণ ঘটে। এই সংমিশ্রিত চিত্র-শিল্প 'ভারতীয় শিল্প' (Indian Art) বা 'মোঘল চিত্র-শিল্প' নামে আজও পরিচিত। যদুনাথ সরকারের ভাষায় "This style holds the field even now under the name of Indian art or Mughal Painting."

<u>উপসংহার</u> :

বাবরের সময়কাল থেকে শুরু করে ঔরঙ্গজেবের সময়কাল পর্যন্ত মুঘল শিল্পকলার মধ্যে একটি শিল্পনৈতিক ক্রমবিকাশ লক্ষনীয়। বাবর বা হুমায়ুনের সময়কাল থেকে যে প্রাসাদ বা মসজিদ নির্মিত হয় তার পর থেকে মুঘল শিল্পরীতি একটি সাংস্কৃতিক হিন্দু-মুসলিম সমন্বয়ের কাজ করে চলেছিল। শেষপর্যন্ত ভারতীয়করণের মধ্য দিয়েই তার শ্রেষ্ঠত্ব প্রতীয়মান হয়। মুঘলযুগ তাই ধর্মীয় ও সাংস্কৃতিক ক্ষেত্রে সমন্বয় ও সহাবস্থানের যুগ নামে পরিচিত। অধ্যাপক Z.U.Malik লিখেছেন, " In Mughal India religious and linguistic homogeneity was neither cherished nor attempted, Insted, a synthesis that combined the prominent traits of divergent religious system and cultural trsditions was sought." কিন্তু ঔরঙ্গজেবের সময়কালে এই সহাবস্থানে ভাটা পড়ে। আর্থিক দুর্বলতা ও অবক্ষয় এবং সাম্রাজ্যিক সংকট পরবর্তী মুঘল সম্রাটদের শিল্প ও স্থাপত্যের জগতে টেনে

প্রশ্নাবলী

১. মৌর্যযুগে শিল্প-স্থাপত্যর অভিনবত্ব বৈশিষ্ট্যগুলি আলোচনা করুন।

২. ভারতীয় সংস্কৃতির ইতিহাসে শুঙ্গ শিল্প-স্থাপত্যের গুরুত্ব আলোচনা করুন।

৩. পল্লব যুগ কি শিল্প-স্থাপত্যের ইতিহাসে নতুন অধ্যায়ের সূচনা করেছিল?

৪. ভারতীয় সংস্কৃতির ইতিহাসে চোল শিল্প-স্থাপত্যের গুরুত্ব কী ছিল?

টিপ্পনী

৫. মুঘলযুগে শিল্প-স্থাপত্যে কোন কোন ধারা লক্ষ্য করা যায়?

সংক্ষিপ্ত :

১. স্তূপ কী?

২. কার্লে বলতে কী বোঝেন?

৩. ‘‘অরুদ্ধ-যবন: সাকেতাম’’, ‘‘অরুদ্ধ যবন সাধ্যমিকায়’’ উক্তিটি কার?

টিপ্পনী

৪. Folk শিল্পকলা কোন সময় দেখা গিয়েছিল?

৫. স্তম্ভযুক্ত ও রথমন্দির কোন স্থাপত্য রীতি?

৬. রাজরাজেশ্বর মন্দির কোন রীতির শ্রেষ্ঠ নিদর্শন?

৭. বাগ মসজিদ কোথায় অবস্থিত?

৮. তাজমহল কোথায় অবস্থিত?

৯. দেওয়ান-ই-খাস এর অবস্থান উল্লেখ করুন?

১০. ‘মোগল চিত্র-শিল্প’ কী?

গ্রন্থপঞ্জী :

১. K.R.Srinivadan, Temples of south India

২. D.N.Jha, Ancient India in Historical Outline

৩. A.L.Bashan, ‘The Wonder that was India’ গ্রন্থের বাংলা অনুবাদ (এই গ্রন্থ থেকে অনেকাংশে সংগৃহীত)

৪. রোমিলা থাপার, ভারতবর্ষের ইতিহাস, থাপারের এই গ্রন্থ থেকেও বেশকিছু সংগৃহীত)

৫. B.N.Luniya:Evolution of Indian Culture (Laxmi Narayan Agarwal)

৬. রামশরণ শর্মা, প্রাচীন ভারতে বস্তুগত সংস্কৃতি ও সমাজ গঠন, ভাষান্তর গৌতম নিয়োগী

৭. সৌমিত্র শ্রিমানী, মুঘল যুগ থেকে কোম্পানি আমল।

- চৈত্য – চৈত্য শব্দের অর্থ বেষ্টিত পবিত্র ভূমি খন্ড।
- দুটি চৈত্য – নাসিক ও কার্লের চৈত্য।
- স্তূপ – বুদ্ধদেব বা বৌদ্ধধর্মের শ্রদ্ধেয় ব্যক্তিদের দেহাবশেষের উপর নির্মিত বিশেষ গৃহ।
- দুটি স্তূপ – ভারদৃত ও সাঁচী।
- বিহার – বৌদ্ধ সাধকদের বসবাসের জন্য নির্মিত মঠগুলি বিহার বা অঙ্ঘারাম।
- শুঙ্গাযুগে নির্মিত স্তূপ ও পেরন আবিষ্কৃত স্থান – ভৌশাম্ভী, কিটা, বেসনঘর, গড়হোরা

প্রভৃতি।

- দ্রাবিড় রীতির সূচনা – পল্লব যুগে।
- মহেন্দ্ররীতি, মামল্লরীতি, রাজসিংহ রীতি ও অপরাজিত রীতি – পল্লবযুগে।
- দ্রাবিড় শিল্পরীতির পূর্ণতা – চোলযুগে।
- রাজরাজেশ্বর মন্দির নির্মাণ করেন – চোলরাজ রাজরাজ।
- চোল স্থাপত্যের মন্দির – সুব্রাহ্মণ্য, ঐরাবতেশ্বর।
- চোল স্থাপত্যরীতি অন্যতম বৈশিষ্ট্য – গোপুরম বা সিংহদ্বার।
- দিনপনাহ নগর স্থাপন – হুমায়ুন।
- পুরান কীলা নির্মাণ – শেরশাহ।
- কীলা-ই-কোন্হান মসজিদ – শেরশাহ।
- আগ্রা দুর্গ – সম্রাট আকবর।
- বুলন্দ দরওয়াজা – আকবর।
- আগ্রা দুর্গে দেওয়ান-ই-আম – সম্রাট শাহজাহান।
- দিল্লীর জামা মসজিদ – শাহজাহান।
- শাহজাহানের আগে মোগল স্থাপত্যের প্রধান উপাদান – লাল পাথর।
- শাহজাহানের সময়ে স্থাপত্যের প্রধান উপাদান – সাদা মার্বেল পাথর।
- শালিমার বাগ নির্মান করেন – জাহাঙ্গীর।

টিপ্পনী

টিপ্পনী

পর্যায় ১.৩. পঞ্চদশ থেকে অষ্টাদশ শতকে ভারতীয় সাহিত্য বিশেষত সংস্কৃত, সঙ্গম এবং বাংলা সাহিত্য

টিপ্পনী

একক ১.৩.০. পটভূমি

একক ১.৩.১. সংস্কৃত সাহিত্য

- সূচনা
- বেদ
- রামায়ণ ও মহাভারত
- জৈন, বৌদ্ধ ও অন্যান্য সাহিত্য
- পরবর্তী সংস্কৃত সাহিত্য
- আধুনিক সংস্কৃত সাহিত্য

একক ১.৩.২. সঙ্গম সাহিত্য

- সূচনা
- সঙ্গম সাহিত্যের পরিধি
- শ্রেণীবিভাগ
- তামিল সঙ্গম
- উপসংহার

একক ১.৩.৩. বাংলা সাহিত্য

- সূচনা
- মধ্যযুগে বাংলা সাহিত্য
- চন্ডীদাস এবং বিদ্যাপতির বৈষ্ণব গীতি কবিতা
- মালাধর বসু এবং কীর্তিবাস ওঝা
- চৈতন্য পরবর্তী বৈষ্ণব সাহিত্য
- উনিশ শতকে বাংলা সাহিত্য
- মাইকেল মধুসূদন দত্ত ও বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়
- বাংলা সাহিত্যে বিভিন্ন ধারায় প্রতিষ্ঠিত কয়েকজনের নাম
- বাংলা সাহিত্য চর্চায় আরো কিছু গুরুত্বপূর্ণ নাম

১.৩. পঞ্চদশ থেকে অষ্টাদশ শতকে ভারতীয় সাহিত্য বিশেষত সংস্কৃত, সঙ্গম এবং বাংলা সাহিত্য

১.৩.০. পটভূমি

বিস্তৃর্ণ ভারতবর্ষের ভৌগলিক মানচিত্রে ভাষার উৎপত্তি অঞ্চল বিশেষে বৈচিত্র্য লক্ষ্য করা যায়। পঞ্চদশ থেকে অষ্টাদশ শতক পর্যন্ত সময়কালও তার ব্যতিক্রম নয়। তবে, ভাষার উৎপত্তির প্রগতির ইতিহাস ধারাবাহিক উন্নীত-সেই দিকটি বিশেষভাবে লক্ষ্য করা গেছে। ভাষার উৎপত্তির প্রথম পর্যায়ের সময়কালটি আনুমাণিক পঞ্চদশ শতকেই শেষ হয়ে যায়। এই প্রেক্ষাপটে আদি মধ্যযুগে সাহিত্যের আঞ্চলিক রূপটি পরিণত তথা গৌরবাজ্বল ভূমিকায় অবতীর্ণ হয় সপ্তদশ শতকের মধ্যবর্তী সময় নাগাদ। তখন ভারতবর্ষে ছিল মুঘল শাসকেরা, তথা মুঘলরাই সেই কৃতিত্বের দাবিদার। আধুনিক ভারতেও বিভিন্ন ভাষায় সাহিত্য রচনা বিশেষভাবে উঠে এসেছে। আর এর উৎপত্তি যে সেই প্রাচীন ভারতে ঘটেছিল সেকথা অস্বীকার করা যায় না। যথা-সংস্কৃত, প্রাকৃত, বাংলা, বিহারি, গুজরাটি, হিন্দি, কানাড়া, কাশ্মিরী, মালয়ালম, ওড়িয়া, পাঞ্জাবি, রাজস্থানি, তামিল, তেলেগু, উর্দু এবং সিন্ধি তারই দৃষ্টান্ত।

১.৩.১. সংস্কৃত সাহিত্য:

সূচনা :

প্রাচীন ভারতে হিন্দুধর্মের অন্যতম প্রধান সাহিত্য বেদ রচিত হয়েছিল সংস্কৃত ভাষায়। সংস্কৃত সাহিত্যের প্রথম রূপটি ছিল ভাষ্য, শুনে শুনেই মনে রাখতে হত। বেদের মধ্যে দিয়ে শুরু এবং লৌহ যুগ পর্যন্ত তার বিস্তার। ভারতীয় সাহিত্যের বিকাশ একাদশ শতক অব্দি দেখা গেলেও; ঐ শতকেই তার পতন শুরু হয়ে যায় ইসলামিক আক্রমণের মধ্য দিয়ে।

বেদ:

বেদ রচিত হয় খ্রিষ্টপূর্ব ১৫০০ থেকে খ্রিষ্টপূর্ব ৬০০ মধ্যে সংস্কৃত ভাষায়। এটিকে প্রাক্ ধ্রুপদী সংস্কৃত হিসাবেও তুলে ধরা হয়। বেদ চারটি পৃথকভাগে বিভক্ত-যথা-ঋক্, যদু, সাম এবং অথর্ব। এছাড়া, বৈদিক সাহিত্যের মধ্যে রয়েছে সংহিতা, ব্রাহ্মণ, আরণ্যক, উপনিষদ এবং সূত্র সাহিত্য। ঋক্বেদ থেকে ''সপ্তসিন্ধু'' অঞ্চলে আর্যদের বসতি স্থাপন এবং তাদের আর্থ-সামাজিক-রাজনৈতিক ও ধর্মীয় জীবন সম্পর্কে জানা যায়। অপরাপর তিনটি বেদ থেকে আর্য সংস্কৃতির নানা বিবরণ, ভারতের বিভিন্ন অঞ্চলে তাদের সম্প্রসারণ এবং আর্য-অনার্য-সংস্কৃতির সংমিশ্রণ সম্পর্কে তথ্য পাওয়া যায়।

রামায়ণ ও মহাভারত :

খ্রিষ্টপূর্ব প্রথম শতক থেকে খ্রিষ্টপূর্ব ষষ্ঠ শতকের মধ্যে সংস্কৃত ভাষায় দুটি বৃহৎ কাজ হল রামায়ণ ও মহাভারতের। মহাকাব্যে বর্ণিত সমস্ত ঘটনাবলী অতিরঞ্জন দোষে দুষ্ট হলেও এর ঐতিহাসিক গুরুত্ব অস্বীকার করা যায় না। তথাপি, এর ঐতিহাসিক মূল্য অপরিসীম।

জৈন, বৌদ্ধ ও অন্যান্য সাহিত্য :

বৌদ্ধ ও জৈন ধর্মগ্রন্থগুলিতে সংস্কৃত ভাষার ব্যবহার লক্ষ্য করা যায়। কুষাণ সাম্রাজ্যের সাহিত্য সংস্কৃত কিন্তু এর সঙ্গে পরে প্রাক্তের প্রভাব উঠে এসেছে। অশ্বঘোষ রচিত 'বুদ্ধচরিত'

ধ্রুপদ সংস্কৃত। অবশ্য পরের দিকে বৌদ্ধদের দ্বারা বিশুদ্ধ সংস্কৃতের পার্দুভাব ঘটেছিল। সারিপুত্র প্রকরণ, বৌদ্ধ মহাযান, তান্ত্রিক দিরামন্ড সূত্র প্রভৃতি তারই দৃষ্টান্ত। এই সময়েই ধ্রুপদী সংস্কৃত সাহিত্যের বেশ কিছু জীবনীমূলক কাজ হয়েছিল। যেমন-বাণভট্ট রচিত 'হর্ষচরিত' এবং কবি বিহ্লণ রচিত 'বিক্রমাঙ্কদেবচরিত'। নাটকের ক্ষেত্রে ভাস, অশ্বঘোষ এবং কালিদাসের নাম বিশেষভাবে উল্লেখ করা যায়। এছাড়া সংস্কৃত ভাষায় রচিত গল্পগুলির মধ্যে অন্যতম হিসাবে উঠে আসে পঞ্চতন্ত্র, হিতোপদেশ, কথাসরিৎসাগর, বৃহৎকথা প্রভৃতি। অন্যদিকে ধ্রুপদী কবিতাগুলির মধ্যে খ্যাতিলাভ করেছিল কালিদাস রচিত কুমারসম্ভবম্ এবং রঘুবংশম, ভারবীর কিরাতার্জুনীয় এবং মাঘ-এর শিশুপালবধ ইত্যাদি। ধ্রুপদি সময়কালেই সংস্কৃত সাহিত্যের অন্যতম নজির হিসাবে পুরাণগুলির কথাও বিশেষভাবে উল্লেখ করা যায়। আঠারোটি পুরাণের মধ্যে বিষ্মপুরাণ, বায়ুপুরাণ, মৎস্যপুরাণ, ব্রহ্মপুরাণ ও ভবিষ্যপুরাণ বিশেষ উল্লেখযোগ্য। পুরাণগুলিতে কিংবদন্তির যুগ থেকে শুরু করে বিভিন্ন রাজবংশের উৎপত্তি, রাজাদের বংশতালিকা, রাজাদের কার্যকলাপ, প্রাচীন ভারতের ভৌগলিক অবস্থা, বিভিন্ন নদ-নদী, পাহাড়-পর্বত, প্রাচীন শহর ও তীর্থস্থানগুলির বিবরণ লিপিবদ্ধ আছে।

টিপ্পনী

<u>পরবর্তী সংস্কৃত সাহিত্য</u> :

পরবর্তীকালে মূলত একাদশ শতকে সংস্কৃত সাহিত্যের মধ্যে অন্যতম হিসাবে উঠে আসে জয়দেব রচিত গীত গোবিন্দ। এছাড়া পাঠ্য হিসাবে ইতিপূর্বেই উল্লিখিত সোমদেব রচিত কথাসরিৎসাগর উল্লেখ করা যায়। একাদশ শতকের পরবর্তীকালে সংস্কৃত সাহিত্যের ধারা বদ্ধ হয়ে পড়ে সৃষ্টি ঘটে সাধারণ সাহিত্য। ব্রাহ্মণ্য তাদের ধারাবাহিকতায় সংস্কৃত সাহিত্যের শিক্ষণীয় দিকটি যেমন উঠে আসতে থাকে তেমনি মুসলিম শাসনকালে রাজকীয় পৃষ্ঠপোষকতাও লাভ করে। বিশেষত আকবরের শাসনকালে সেই ধারাবাহিকতা পুন:রায় প্রতিষ্ঠালাভ করে। দর্শন তত্ত্বেও সংস্কৃতের প্রচলন শুরু হয়ে যায়। ত্রয়োদশ শতক নাগাদ প্রতিষ্ঠিত হয় ডিঙিয়াটা স্থল। মল্লিনাথ এবং ভাটোজি দীক্ষিত এই সময়কার সংস্কৃতভাষার অন্যতম ব্যক্তিত্ব হিসাবে বিবেচিত হন।

<u>আধুনিক সংস্কৃত সাহিত্য</u> :

আধুনিক সংস্কৃত সাহিত্য তৈরীতে নতুন একটি উদ্যম লক্ষ্য করা যায়। স্কুল, কলেজ বা বিশ্ববিদ্যালয় স্তরে এই প্রচেষ্টা বিশেষভাবে উঠে আসছে। কর্মনিযুক্তির ক্ষেত্রে সংস্কৃত ভাষা তথা সাহিত্যের মানুষ বিশেষ দাবিদার হয়ে ওঠেছে। একথা মনে রাখা দরকার ভারতীয় মনিষীর অতীত অন্বেষণে সংস্কৃত জানা ছাড়া গত্যন্তর নেই। নবম থেকে দীর্ঘ এগারো বছর সময়কালে সংস্কৃত নাটকের ওপর কাজ করেছেন ড: রামজি উপাধ্যায়। এছাড়া সংস্কৃতের ওপর কার্যাদির সংখ্যা তিন হাজারকে অতিক্রম করে চলেছে।

১.৩.২ <u>সঙ্গম সাহিত্য</u> :

<u>সূচনা</u>:

ভারতীয় সংস্কৃতির অপরাপর দুটি ধারা-একটি উত্তর ভারতকেন্দ্রিক অপরটি দক্ষিণ ভারতকেন্দ্রিক। সাহিত্য এর মধ্যে স্থিত তার ব্যতিক্রম নয়। খ্রিষ্টপূর্ব তৃতীয় শতক থেকে খ্রিষ্টীয় চতুর্থ শতক পর্যন্ত দক্ষিণ ভারতের ইতিহাস সঙ্গম যুগ হিসাবেই পরিচিত। সাহিত্যের দ্বারা সূচিত এই যুগ সঙ্গম সাহিত্যের মধ্য দিয়েই উৎকর্ষতা প্রমাণ করেছিল। ৪৭৩ জন কবির রচিত ২৩৮১ টি কবিতা সেই উজ্জ্বলতার দিকই উন্মোচিত করে। প্রাথমিকভাবে সঙ্গম সাহিত্য

ধর্মনিরপেক্ষ কিন্তু দৈনন্দিন দেশীয় জীবনচিত্রকে অবলম্বন করেই তা রচিত। বিষয়সূচিতে বস্তুবাদও যেমন রয়েছে তেমন রয়েছে আবেগের স্থান। সবকিছুই উঠে এসেছে সঙ্গম সাহিত্যে। উঠে আসা দু:খ, যুদ্ধ, ভালোবাসা এবং বাণিজ্য–এসব তারই দৃষ্টান্ত।

সঙ্গম সাহিত্যের পরিধি :

টিপ্পনী

সমাজের বিভিন্ন পেশা ও শ্রেণীর তামিল কবিরা সঙ্গম সাহিত্য রচনা করেছেন নারী ও পুরুষকে কেন্দ্র করেই। এক্ষেত্রে উভয়ের গুরুত্ব তাঁরা যে সমধিক উপলব্ধি করেছিল এ তারই এক উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত। পরবর্তী পর্যায়ে ১০০০ খ্রিষ্টাব্দ সময় পর্যন্ত কবিরা সমাজ বিজ্ঞানের বিভিন্ন বিষয় তাঁদের কবিতার মাধ্যমে তুলে ধরেছেন। খুব শীঘ্রই সংস্কৃতির অন্যান্য ধারার ন্যায় সঙ্গম সাহিত্যেরও পতন এগিয়ে আসে। কিন্তু উনিশ শতকে বেশ কিছু গবেষকের আন্তরিক প্রচেষ্টায় সঙ্গম সাহিত্য আবার পুন:রায় আবিষ্কৃত হয়। এদের মধ্যে খ্যাতনামা সঙ্গম সমাজজীবনের তামিল গবেষক তিতুকাল্লুকার নাম বিশেষভাবে উল্লেখ করা যায়। একইভাবে খ্যাতিমান হন তামিল কবি মামুলানার। এই প্রেক্ষাপটে তামিল সাহিত্য, ও কবিতায় সারস্বত দিকটির উন্মোচনে একটি উদ্ধৃতি টানা যেতে পারে। " In their antiquity and their contemporaneity, there is not much else in any Indian lirerature equal to these quiet and dramatic tamil poems. In their values and stances, they represent a mature classical poetry: passion is balanced by courtesy, transparency by ironies and nuances of design, impersonality by vivid detail, austerity of line by richness of implication. These poems are not just the eariiest evidence of the Tamil genius. The Tamils, in all their 2000 years of literary effort, wrote nothing better." (Kamil Zvelebil Quotes A.K.Ramanujan)

শ্রেণীবিভাগ:

সঙ্গম কবিতা বিশেষত্বের দিক থেকে পৃথক দুটি শ্রেণীতে বিভক্ত হয়ে পড়েছে। একদিকে ভিতর থেকে উঠে এসেছে শারিরীক সম্পর্ক এবং ভালোবাসা। অপরদিকে বাহ্যিক দিকটিতে মানুষের সামাজিক বা জাতিত্বের বিভিন্ন দিক প্রস্ফুটিত হয়েছে। আবার পরিবেশগত দিক থেকে সঙ্গম সাহিত্য পদ্ধতিগত শ্রেনীবিন্যাসের ব্যাখ্যার কথাও তুলে ধরেছে। এক্ষেত্রে তারই দৃষ্টান্তস্বরূপ 'কোলকাপ্পিয়াম' অন্যান্যগুলির মধ্যে উল্লেখযোগ্যের দাবি রেখে চলেছে। এর মধ্যে ভূমিকেন্দ্রিকতা, জঙ্গলকেন্দ্রিকতা বা উপকূলকেন্দ্রিকতা অথবা পর্বতকেন্দ্রীকতার ভালোবাসার বিভিন্ন দিকও উঠে এসেছে।

তামিল সঙ্গম:

তামিল সাহিত্য প্রতিষ্ঠানিক; এর লেখক বা কবিরা পেশাগত ভাবেই তাদের কার্যাদি প্রকাশিত করে চলেছিল। দক্ষিণ ভারতে পান্ড্য শাসকদের এক্ষেত্রে একটি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পরিলক্ষিত হয়। আসলে 'সঙ্গম' শব্দের উৎপত্তি ঘটেছিল ইন্দো-আর্য ভাষা থেকেই। বরং সঙ্গম সাহিত্যে এর ব্যবহার প্রায় অনুপস্থিত। জৈন বা বৌদ্ধ ধর্মের তীর্থঙ্কর বা সন্ন্যাসীদের সভাকক্ষ থেকে 'সঙ্ঘ' (Sangha) শব্দটি এসেছে-সাহিত্যে তার যথাযথ সমাবেশ ঘটেছে। 'সঙ্গম সাহিত্য' শব্দটি খ্রিষ্টপূর্ব ২০০ থেকে ২০০ খ্রিষ্টাব্দের মধ্যে রচিত তামিল কার্যাদির মধ্যে ব্যবহৃত হয়েছিল।

উপসংহার:

সঙ্গম সাহিত্যের লিখিতরূপ কয়েক শতক আগেই ফুরিয়ে গেছে। স্বভাবতই, বিভিন্ন তামিল গবেষক সেগুলিকে পু:নরায় জনসমক্ষে তুলে ধরার চেষ্টায় ব্যাপৃত রয়েছেন। তাঁদের মধ্যে কয়েক জন হলেন এ.নাভালার, এস.ভি. দামোদরম পিল্লাই, ইউ. ভি. স্বামীনাথ আয়ার প্রমুখগণ। তাঁর গবেষণামূলক পদ্ধতিতে সমস্ত বিষয়টিকে উপস্থাপন করার মধ্য দিয়ে অতীত ঐতিহ্যকে তুলে ধরেছেন।

১.৩.৩. বাংলা সাহিত্য :

টিপ্পনী

সূচনা:

বাংলা ভাষা থেকেই বাংলা লিখিত সাহিত্য উঠে এসেছে। বাংলা সাহিত্যের প্রাচীনতম কাজ হল চর্যাপদ। এতে দশম ও একাদশ শতাব্দীর বৌদ্ধধর্মের গানের সংমিশ্রণ লক্ষ্য করা যায়। বাংলা সাহিত্যের দুটি ধারা-একটি ১৩৬০ থেকে ১৮০০ পর্যন্ত, মধ্যযুগ পর্যন্ত এবং আধুনিক যুগের সূচনা ঘটে ১৮০০ খ্রিষ্টাব্দেই। মধ্যযুগে মঙ্গল কাব্য, মহাকাব্যের অনুবাদ, চৈতন্য মহাপ্রভুর জীবনী এবং ধর্মনিরপেক্ষ গ্রন্থও রচিত হয়েছিল।

মধ্যযুগে বাংলা সাহিত্য:

চৈতন্য মহাপ্রভুর আদি বৈষ্ণব সাহিত্য যেটি প্রাক্-চৈতন্য সাহিত্য রূপে আখ্যায়িত 'গৌড়ীয় বৈষ্ণবাদ' এই সময়ে বাংলা ভাষায় রচিত হয়। বরু চন্ডীদাসের শ্রীকৃষ্ণ কীর্তন, বিদ্যাপতি এবং চন্ডীদাসের গীত কবিরা বৈষ্ণব পদাবলী, মালাধর বসুর শ্রীকৃষ্ণ বিজয় (ভাগবৎ পুরান থেকে অনুবাদ) এবং কৃত্তিবাসের কৃত্তিবাসি রামায়ণ এসব মধ্যযুগের বাংলাসাহিত্যের দৃষ্টান্ত।

চন্ডীদাস এবং বিদ্যাপতির বৈষ্ণব গীতি কবিতা :

খ্রিষ্টীয় পঞ্চদশ শতকে বাংলা ভাষায় বৈষ্ণব গীতি কবিরা বা পদাবলীর উৎপত্তি ঘটে। বিদ্যাপতি খ্রিষ্টীয় চতুর্দশ শতকে মৈথালি ও বাংলা ভাষায় লিখে মধ্যযুগের বাংলা সাহিত্যকে উচ্চাসনে নিয়ে যায়। বাংলা লেখকরা এর দ্বারা বিশেষভাবে প্রভাবিত হয়েছিলেন। খ্রিষ্টীয় পঞ্চদশ শতকে বাংলা পদ্য বা বৈষ্ণবগীতির জন্য চন্ডীদাসের নাম বিশেষভাবে উল্লেখ করা যায়। তিনি মানবতাবাদীর ঘোষক রূপেও অধিক পরিচিত-তার কাছে মানুষই ছিল চরম সত্য-এর বাইরে কোনকিছুর গুরুত্ব ছিল না।

মালাধর বসু ও কৃত্তিবাস ওঝা:

বিভিন্ন ভাষার গ্রন্থ বা বইগুলি থেকে বাংলাভাষায় অনুবাদের কাজটি মধ্যযুগেই আধিক্য লক্ষ্য করা যায়। যথা-ভাগবৎ পুরান, রামায়ঢ়, শ্রীকৃষ্ণ বিজয় কাব্য প্রভৃতি। খ্রিষ্টীয় পঞ্চদশ শতকে রামায়ণ থেকে কৃত্তিবাস কর্তৃক অনুবাদিত হয় কৃত্তিবাসী রামায়ণ।

চৈতন্য পরবর্তী বৈষ্ণব সাহিত্য:

পরবর্তী বৈষ্ণব বা উত্তর চৈতন্য সাহিত্য চৈতন্য মহাপ্রভুর সময়কালেই লেখা হয়েছিল। এই সাহিত্যে চৈতন্যের জীবনী গৌড়ীয় বৈষ্ণবের বিভিন্ন গবেষক ও কবিদের দ্বারা রচিত হয়েছিল এবং পরে চৈতন্যর জীবনকেন্দ্রীক রচিত হয় বৈষ্ণব পদাবলী। এছাড়া বৈষ্ণব সাহিত্যে একটি বৃহৎ জায়গা জুড়ে ছিল বলরাম দাস, গোবিন্দ দাস, জয়ানন্দ, বৃন্দানন্দ দাস, তুকারাম এবং

কৃষ্ণদাস কবিরাজ প্রমুখগণ।

উনিশ শতক:

উনিশ শতকের দ্বিতীয়ার্ধে বাংলা সাহিত্য অধিক জনপ্রিয়তা অর্জন করেছিল। এই সময়ে বাংলা থেকে যেমন অনুবাদের কাজ বলেছিল একইভাবে ভারতীয় অপরাপর ভাষায় শিক্ষনীয় দিকটিও ব্রিটিশের কাছে উন্মোচিত হয়। আধুনিক ভারতের প্রথম পুরুষ রাজা রামমোহন রায় বিভিন্ন ধরনের ধর্মীয় গ্রন্থ যেমন রচনা করেছিলেন তেমনি সংস্কৃত থেকে অনুবাদ করে পুস্তক ও পত্রিকার দ্বারা প্রচারের ব্যবস্থাও করেছিলেন। তিনি প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যের যথার্থ মেলবন্ধন ঘটিয়েছিলেন। অমলেশ ত্রিপাঠী তাঁকে Traditional Modernixer" রূপে আখ্যায়িত করেছেন। 1815 তে প্রতিষ্ঠিত হয় 'আত্মীয় সভা', এটি ছিল সাংস্কৃতিক গ্রুপ। এই যুগেই বাংলা সাহিত্যের আর এক উল্লেখযোগ্য নাম ঈশ্বরচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, যিনি ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর নামে অধিক পরিচিত।

মাইকেল মধুসূদন দত্ত ও বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়:

মাইকেল মধুসূদন দত্ত বাংলা সাহিত্যের আর এক উজ্জ্বল নাম। তাঁর সনেট ও সাহিত্যিক মহাকাব্য আজও সমাদৃত। ১৮৬০ খ্রীষ্টাব্দে তাঁর প্রথম মহাকাব্য 'তিলোত্তমা সম্ভব কাব্য' (পুরাণ থেকে সংগৃহীত), এবং ১৮৬১ খ্রিষ্টাব্দে প্রকাশিত হয় মেঘনাদবধ কাব্য (রামায়ণ থেকে নেওয়া)। এছাড়া, চতুর্দশপদী কবিতাবলির জন্য তার নাম বিশেষভাবে স্মরণীয়। বাংলা গদ্যসাহিত্য ও উপন্যাসে উনিশ শতকের বঙ্কিমচন্দ্রের কৃতিত্বও স্মরণ করতে হয়। বাংলা সাহিত্যে তাঁর প্রথম উপন্যাস দুর্গেশনন্দিনী। এছাড়া ভারতীয় জাতীয় সংগীত 'বন্দেমাতরম' লেখা হয় 'আনন্দমঠ' উপন্যাস থেকে।

বাংলা সাহিত্যে বিভিন্ন ধারার প্রতিষ্ঠিত কয়েকজনের নাম :

- ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত
- বিহারীলাল চক্রবর্তী
- কাইকোবাদ
- রমেশ চন্দ্র দত্ত
- মির মোশরফ হোসেন
- অক্ষয় কুমার বরুল
- রামেন্দ্র সুন্দর ত্রিবেদী
- ত্রিবিশচন্দ্র ঘোষ
- দ্বিজেন্দ্রলাল রায়
- রামসুন্দরী দেবী

উনিশ শতকে বাংলা ভাষায় বিকশিত হয়েছিল দৈনিক, সাপ্তাহিক ও মাসিক পত্রিকা; একইভাবে সাহিত্য ও শিক্ষাস্তরে প্রাতিষ্ঠানিকতা লাভ করেছিল। এই সময়ের প্রথম দিকে বাংলা ভাষাকে যিনি বিশ্বসাহিত্যের দরবারে পৌঁছে দিয়েছিলেন তিনি হলেন রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর। বাংলা ভাষার নবজীবনপ্রাপ্তি তাঁর লেখনীতে পাওয়া যায়। তিনি বিশ্বকবি হিসাবেও বরণীয়। এছাড়া

কাজি নজরুল ইসলাম সাধারণ মানুষের জন্য সমগ্র জীবন আপোষহীন সংগ্রাম চালিয়ে ছিলেন-'বিদ্রোহী কবি' রূপে আখ্যায়িত এই মানুষটির সাহিত্যচর্চার ভাষা ছিল বাংলা।

সাহিত্যচর্চায় আরো কিছু গুরুত্বপূর্ণ নাম (স্বাধীনতার পরেও)

- নুরুল মোমেন
- বিজন ভট্টাচার্য্য
- অমর মিত্র
- বলাইচাঁদ মুখোপাধ্যায়
- বিভূতিভূষণ মুখোপাধ্যায়
- বিমল কর
- বিমল মিত্র
- হুমায়ূন আহমেদ
- জগদীশ গুপ্ত
- কমল কুমার মজুমদার
- মণি শঙ্কর মুখার্জ্জী
- মাণিক বন্দ্যোপাধ্যায়
- ঋত্বিক ঘটক
- সমরেশ বসু
- সন্দীপন চট্টোপাধ্যায়
- শরদিন্দু বন্দ্যোপাধ্যায়
- শরৎ চন্দ্র চট্টোপাধ্যায়
- সতীনাথ ভাদুড়ী
- সত্যজিৎ রায়
- শওকত ওসমান
- সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়
- সৈয়দ সামসুল হক্
- তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়
- অমর মিত্র
- বাসুদেব দাসগুপ্ত
- বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়

টিপ্পনী

টিপ্পনী

- লীনা মজুমদার
- নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়
- নরেন্দ্রনাথ মিত্র
- প্রেমচাঁদ মিত্র
- রাজশেখর বসু
- রতনলাল বসু
- শাহিদুল জাজির
- শিবরাম চক্রবর্তী
- সুবিমল মিশ্র
- সুবোধ ঘোষ
- সৈয়দ ওয়ালিউল্লাহ
- আবদুল মান্নান সৈয়দ
- আবুল হাসান
- আল মহম্মদ
- অতুলপ্রসাদ সেন
- বুদ্ধদেব বসু
- জসীমুদ্দীন
- যতীন্দ্রমোহন বাগচী
- জীবনানন্দ দাস
- কুমুদ রঞ্জন মল্লিক
- রজনীকান্ত সেন
- শামসুর রহমান
- রামপ্রসাদ সেন
- আব্বাস উদ্দীন
- মহম্মদ আসাদুল্লাহ আল-গালিব
- শাহিদুল্লাহ কৈসর
- আসান হাবিন
- ফারুস আহমেদ
- সৈয়দ আলি হাসান

- আবু-জাফর ওবিদুল্লাহ
- সুফিয়া কামাল
- আবুবকর সিদ্দিক
- গুলাম মুর্শিদ
- সেলিনা হোসেন
- অরুনাভ সরকার
- রফিক আজাদ
- নির্মলেন্দু গুণ
- তসলিমা নাসরিন
- আবিদ আজাদ
- হাসান হাফিজুর রহমান
- শহীদ কাজেরি
- আবু হাসান শাহরিয়র
- খন্দোকর আসরাফ হোসেন
- হীলাল হাফিজ
- আশুতোষ মুখোপাধ্যায়
- নবনীতা দেব সেন
- সৈয়দ মুস্তাফা সিরাজ
- অতীন বন্দ্যোপাধ্যায়
- শক্তি চট্টোপাধ্যায়
- মহাশ্বেতা দেবী
- মতি নন্দী
- শঙ্কর
- সুচিত্রা ভট্টাচার্য্য
- বাণি বসু
- বুদ্ধদেব গুহ
- আব্দুল জব্বর
- নিহার রঞ্জন গুপ্ত
- অচিন্ত্য কুমার সেনগুপ্ত

টিপ্পনী

- অন্নদাশঙ্কর রায়
- প্রেমেন্দ্র মিত্র
- অমিয় চক্রবর্তী
- বিষ্ণু দে
- সমর সেন
- সুভাষ মুখোপাধ্যায়
- সুধীন্দ্রনাথ দত্ত
- সুকান্ত ভট্টাচার্য্য
- বিধ্যক ভট্টাচার্য্য
- প্রমথনাথ বিশি
- সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়
- বিনয় মজুমদার
- ফাল্গুনি রায়
- মলয় রায়চৌধুরী
- সমির রায়চৌধুরী
- ত্রিদিব মিত্র

টিপ্পনী

এছাড়া উঠে এসেছে প্রকল্পনা আন্দোলন;সাহিত্য বিপ্লবে যার অবদানকে অস্বীকার করা যায় না।

প্রশ্নাবলী

১. পঞ্চদশ থেকে অষ্টাদশ শতকে ভারতে সংস্কৃত সাহিত্যের বিকাশ সম্পর্কে আলোচনা করুন।

২. ভারতীয় সাহিত্যের ইতিহাসে সঙ্গম যুগের অবদান কী ছিল?

৩. বাংলা সাহিত্যের বিকাশ সম্পর্কে আলোচনা করুন।

সংক্ষিপ্ত :

১. বেদের রচনাকাল উল্লেখ করুন।

২. রামায়ন কোন সময়ের রচনা?

৩. ‘হর্ষচরিত’ কার রচনা?

৪. পুরানের সংখ্যা কয়টি?

৫. ‘তোলাকাপ্পিয়াম’ কী?

৬. ‘সঙ্গম সাহিত্য’ শব্দটি কোথায় বেশী ব্যবহৃত হয়েছে?

৭. মানবতাবাদীর ঘোটকরূপে কে আখ্যায়িত?

৮. কে 'Traditional Moderniter' রূপে আখ্যায়িত?

৯. চতুর্দশপদী কবিতা কার নামের সঙ্গে অধিক পরিচিত?

১০. প্রকল্পা কোন ভাষাসাহিত্যের আন্দোলন?

টিপ্পনী

গ্রন্থপঞ্জী:

১. R.C.Majumder et al(Ed) History and Culture of Indian People.V.I,II and III

২. S.A.A. R$_{12vi}$, ' The Wonder that was India' Vol-II গ্রন্থের বাংলা অনুবাদ

৩. Satish Chandra Medieval India, Vol-I

৪. সুমিত সরকার, আধুনিক ভারত

টিপ্পনী

১.৪ প্রাচীন ভারতে নারী বা আদিপর্বে ভারতীয় মহিলা :

টিপ্পনী

গঠন

- ভূমিকা
- তথ্যসূত্র ও আইনের দৃষ্টিতে নারী
- উপসংহার
- গণিকাদের কথা (ভূমিকা)
- গণিকাদের রাষ্ট্রীয় স্বীকৃতি ও বিভিন্ন ধরনের বারাঙ্গনা
- বিধবাদের প্রসঙ্গে দু'চার কথা (সূচনা)
- তথ্যসূত্র ও স্মারকে বিধবাদের চিত্র
- উপসংহার

প্রাচীন ভারতে নারী:

ভূমিকা:

আদিম মানুষের ইতিহাস পর্যবেক্ষণ করলে লক্ষ্য করা যায় দীর্ঘ সময়ের (Long time) বিবর্তনে ক্রমশ সঙ্ঘবদ্ধ ও সমাজবদ্ধের মধ্য দিয়ে 'অধিকার' আদায় করেছে। পরিবর্তন ঘটেছে সমাজ ও রাষ্ট্রের। এক এক সময় সমাজ বা রাষ্ট্রের দৃষ্টিভঙ্গিতে মানুষের মধ্যে গ্রথিত হয়েছে বৈষম্য। আর এর থেকেই উঠে এসেছে শোষণ, শাসন ও নির্যাতন-সেখানে নারীরাই সর্বাধিক শোষিত ও নির্যাতিত পুরুষের তুলনামূলক নিরীখে। তবে, বেশ কিছু সংখ্যক নারী তাদের অধিকার আদায়েও সক্ষম হয়েছিলেন, এদের সংখ্যাটা একেবারেই অল্প।

তথ্যসূত্র ও আইনের দৃষ্টিতে নারী:

প্রাচীন ভারতে আইনের দৃষ্টিভঙ্গীতে নারী সর্বদাই ছিল নাবালিকা। সহজভাবে বলতে গেলে যা দাঁড়ায় তা হল বাল্য, যৌবন ও বার্ধক্যে সে থাকবে যথাক্রমে পিতামাতা, স্বামী ও পুত্রদের অধীন। এমনও নজির দেখা গেছে বৌদ্ধধর্মের অপেক্ষাকৃত উদার ব্যবস্থাতেও একজন প্রাজ্ঞ সন্ন্যাসিনীকে-নবদীক্ষিত পুরুষদের ভেতরে যে সর্বকনিষ্ঠ ভারত অধীনস্থ হয়ে থাকতে হত। একজন নারী বা একজন শূদ্রকে হত্যা করলে সমপরিমাণ অর্থদন্ড দিয়ে অব্যাহতি পাবার ব্যবস্থাও ছিল। এই দিকটি অবশ্যই স্পর্শকাতর ও ভয়াবহ হিসাবে পর্যবসিত হয়। স্ত্রীর ব্যক্তিগত সম্পত্তি বলতে তখন বস্ত্র ও অলঙ্কার সমূহকেই বোঝানো হত। অবশ্য, কৌটিল্যের অর্থশাস্ত্রে স্ত্রীর টাকাকড়ির অধিকার স্বীকৃত আছে। যদিও এর পরিমান সীমাবদ্ধ রাখা হয়েছে। অর্থের সেই সীমারেখা অতিক্রম করলেই তাতে স্বামীর অধিকার স্বীকৃত ছিল। আবার স্ত্রীর সম্পত্তিতে স্বামীর কিছু কিছু অধিকার স্বীকৃতও ছিল। এক্ষেত্রে সংকটকালীনে তা বিক্রী করা বা নির্বিচারে সেই সম্পত্তি যাকে খুশি না দেওয়াতে স্বামীর ভূমিকা লক্ষ্য করা গেছে। স্ত্রীর মৃত্যুর পর তার সম্পত্তি চলে যেত কণ্যাদের হাতে, স্বামী বা পুত্রদের হাতে নয়। একথা অস্বীকার করার উপায় নেই যে পৃথিবীর অন্যান্য দেশের তুলনায় সেই সময়ের ভারতের নারীরা অধিক সম্পত্তিবান ছিল।

এক্ষেত্রে সভ্যতার উদয় দেশগুলিও ভারতের কাছে সেই দিকটিতে মলিন হয়ে যায়।

মেয়েরা ইচ্ছে করলেই যে কোনো সময় গার্হস্থ্য জীবন ত্যাগ করে ধর্মজীবনের পথে যেতে পারতেন। তবে পূজা-অর্চনায় তাদের কোনোরকম অধিকার ছিল না। অনেকে মনে করেন বেদের কোনো কোনো স্তোত্র নারীর রচিত। এই সময়েই নারী অধিক পারদর্শী ও প্রশ্নবান হয়ে ওঠে। আলোচনাসভা বা বিচারসভাতেও তারা যোগ দেয়। 'গার্গী'র নাম এক্ষেত্রে অবশ্যই উল্লেখ্যনীয়। মেয়েরা ধর্মচর্চায় জীবন কাটাক-এটা সমাজ খুব একটা অনুমোদন করত না। সমাজ চাইত মেয়েরা বিবাহিত জীবনে প্রবেশ করে পুরুষ ও শিশুদের দেখাশোনা করুক। যে সমস্ত মেয়েরা শিক্ষিত হতেন তারা অপেক্ষাকৃত উচ্চশ্রেণীর বলেই মনে হয়। এই সময় সংস্কৃত কাব্য ও নাটকে মেয়েদের দূরদর্শীতার পরিচয় মেলে। উন্নত সংস্কৃত সাহিত্যে যেসব মহিলার চিত্র পাই তাঁদের প্রায়শরই দেখা যায় অধ্যয়নে, রচনায় এবং সঙ্গীত সৃষ্টিতে নিরত থেকেছে। মনে হয় তৎকালীন সবকরম শিল্পেই তাঁদের ভালো দখল ছিল। ভারতে মধ্যযুগ থেকে আধুনিক বা সাম্প্রতিককাল পর্যন্ত নাচ ও গান ভালো ঘরের মেয়েদের একেবারেই মানায় না বলা হয়ে এসেছে এবং এসবের চর্চা সীমাবদ্ধ থেকেছে শুধু নিচু হাতের মেয়ে ও দেহোপঞ্জীবনীদের ভিতরে। প্রাচীন ভারতে কিন্তু অবস্থা অন্যকরম ছিল। সচ্ছল ঘরের মেয়েরাই কেবল নাচ, গান ও অন্যান্য মহিলাজ্জনোচিত শিল্পে আত্মীকভাবে নিযুক্ত হতেন।

মুসলিম যুগে দেখা গেছে উত্তর ভারতে হিন্দু মেয়েরা পর্দাপ্রথা গ্রহণ করেছিল। এই প্রথা অনুযায়ী যৌবনপ্রাপ্তি থেকে শুরু করে বার্ধক্য পর্যন্ত মেয়েরা স্বামী ও একান্ত ঘনিষ্ঠ আত্মীয় ছাড়া অন্য সব পুরুষের দৃষ্টি থেকে আড়ালে থাকত। এ প্রথা প্রাচীন ভারতে ছিল না। তবে অনেকে আবার হিন্দু যুগের শেষের দিকে যে সব আপত্তিমূলক রীতিনীতি দেখা গিয়েছিল তাদের যে প্রাচীন ভারতের সাংস্কৃতিক জীবনে কোনোই স্থান ছিল না এটি দেখাবার আগ্রহে ঐ যুগে বিবাহিতা নারীদের স্বাধীনতা ভোগ করার যে ছবি এঁকেছেন তাও প্রায়ই অত্যুক্তিপূর্ণ। ঋগ্বেদে আমরা দেখতে পাই অবিবাহিতা তরুণীরা যুবকদের সঙ্গে অবাধে মিশছে এবং দেখতে পাই না যে বিবাহিতা নারীদের কোনোরকম আড়াল করে রাখা হয়েছে। অবশ্য ঋগ্বেদে হিন্দু সংস্কৃতির সমৃদ্ধির বহু আগেকার রচনা। রাজারা তো তাঁদের অন্ত:পুরস্থনারীদের লোকচক্ষুর অন্তরালেই রাখতেন। অবশ্য,পরবর্তীকালে মুসলিম সমাজের পর্দাপ্রথার মতো অত কঠোর ছিল না হিন্দুযুগের অন্ত:পুর প্রথা। অপরদিকে সমাজের উচ্চবংশীয় পরিবারগুলিতেও মেয়েদের দূরেই রাখা হত পুরুষদের সংস্পর্শ থেকে। অর্থশাস্ত্রে দুর্বিনীতা স্ত্রীর প্রতি কঠোর শাস্ত্রীর বিধান দেওয়া রয়েছে। এক্ষেত্রে, অবস্থা ও পরিস্থিতি অনুযায়ী অর্থদন্ড বৃদ্ধি ও কশাঘাতের কথা বলা হয়েছে।

আবার সামাজিক রীতিনীতির বিরাট বৈচিত্র ছিল ক্ষেত্র বিশেষে। ভালোশ্রেণীর বিবাহযোগ্য মেয়েদের যে সব বর্ণনা নানা কাহিনীতে পাওয়া যায় তাতে দেখা যায় যে তারা মন্দিরে আসছে এবং উৎসবে যোগ দিচ্ছে সম্পূর্ণ স্বাধীনভাবেই। ভারহূত ও সাঁচীর ভাস্কর্যে আমরা লক্ষ্য করি ধনীগৃহের মহিলারা কটি পর্যন্ত নগ্ন অবস্থাতে অলিন্দ থেকে ঝুঁকে পড়ে পথের শোভাযাত্রা দেখছেন। এছাড়া চোখে পড়ে পুরুষদের সঙ্গে একত্রে স্বল্পবাসা নারীর দল বোধিবৃক্ষের পূজায় রত। অবশ্য সমাজে সিদ্ধান্ত বা দায়িত্ব নেবার অধিকার স্ত্রীর ছিল না। তার প্রধান কাজ স্বামীর সেবা বা পরিচর্যা করা বা স্বামীর ক্লান্তীতে পদসেবা করা। আর পালনীয় কর্তব্য ছিল তার স্বামীর আগে ঘুম থেকে ওঠা এবং স্বামীর পরে আহার ও শয়ন করা। মনু স্মৃতিতে আছে

> ''স্বাধীন ভারতে তার অনুচিত কোনো কিছু করা
> এমন কি নিজ গৃহতেও।
> শৈশবে সে পিতার অধীন-
> যৌবনে স্বামীর।

টিপ্পনী

স্বামী চলে গেলে তার অধীনতা পুত্রদের কাছে।
স্বাধীনতা কভু সে পাবে না।

প্রফুল্ল মনেতে যেন থাকে সে সর্বদা,
ঘরের কাজেতে যেন সদা থাকে পটু,
বাসনপত্র যেন রাখে পরিষ্কার,
অর্থব্যয়ে সাধ্যমতো বাধা যেন দেয়.......''

''প্রতিটি মূহুর্ত জীবনের
তৃপ্তি তার স্বামীতে শুধু
সুপবিত্র অনুষ্ঠানে যে তাকে করেছে গ্রহণ
সেই তাকে সুখ দেয় ইহলোকে পরলোকে সদা।''

''অভব্য যদি বা তার হয় আচরণ
আর মতি শুধু ভোগ লালসায়,
মানুষটি যদি হয় একান্ত নির্গুণ–
পুণ্যবতী পত্নী তবু তার
স্বামীপূজা করে যাবে ঈশ্বরজ্ঞানেতে।''

ভারতীয় নারীত্বের অদ্বিতীয় মহান আদর্শ হলেন সীতা। স্বামী রামের বিশ্বস্ত সাথী হয়ে তাঁর সঙ্গে বনে নির্বাসনে গিয়েছিলেন। প্রলোভনকে জয় করে অজস্র কষ্ট ভোগ করেছিলেন। অন্তিমে সতীত্বের অগ্নিপরীক্ষা তাকে আজও অমর করে রেখেছে। স্বামীর প্রতি স্ত্রী আনুগত্য থাকলেও তার স্থান অসম্মানের ছিল না। মহাভারতে আছে:

''স্ত্রী স্বামীর অর্ধভাগ, বন্ধু সর্বোত্তম–
জীবনের তিন লক্ষ্য পূরণের মূলে,
পরলোকে সব কিছু পাবার সাহায্য করে সে'ই।''

''স্ত্রী দেয় বলিষ্ঠ সব কাজের প্রেরণা...
স্ত্রী হতে সাহস পায় স্বামী
আর পায় নিরাপদ শান্তির আশ্রয়....''

''দুঃখের আগুনে পোড়ে যখন হৃদয়
ব্যাধিতে আচ্ছন্ন যবে ক্লিষ্ট দেহখানি,
স্ত্রীর দু'টি হাতে আসে শান্তি ও আশ্বাস
তাপদগ্ধ দেহ মানবের
যেমন স্নিগ্ধ হয় শীতল জলেতে।''

''ক্রোধের কবলে পড়ে কিছুতে পুরুষ
কখনও হবেনা রূঢ় রমনীর প্রতি;
ভুলবেনা কভু তার উপরে নির্ভর
আনন্দ প্রেমের, সুখ, ধর্মের তরেতে।''

টিপ্পনী

''রমনীই সেই চিরবিস্তৃত প্রান্তর
যাতে তার সত্তা জন্ম নেয় বারে বারে।''

স্বামী স্ত্রী উভয়েই সমান। উভয়ে পরস্পরের প্রকৃত বন্ধু সময়, অসময় এমনকী আমৃত্যুকাল পর্যন্ত। স্বামী স্ত্রীকে তার সাধ্যমতো রত্নালাংকার ও বিলাসদ্রব্য দিয়ে। খুব কঠিন সময়েও স্ত্রীকে তিরস্কার করবে না। মূলত এসব কিছুর মধ্যে দিয়ে নারীদের প্রতি শ্রদ্ধা ও সম্মানসূচক অভিব্যক্তি প্রাচীন ভারতীয় সাহিত্যে উঠে এসেছে।

টিপ্পনী

উপসংহার:

প্রাচীন ভারতে নারীদের সম্বন্ধে পরস্পর বিরোধী মতবাদ উঠে এসেছে। নারীকে একই সঙ্গে মনে করা হত দেবী ও ক্রীতদাসী। প্রাচীন ভারতে হরপ্পা বা সিন্ধু সভ্যতা ছিল মাতৃকেন্দ্রিক। কালক্রমে বৈদিকযুগ হয়ে ওঠে পিতৃতান্ত্রিক। আর ক্রীতদাসীদের দেখা হতো ঘৃণিত বেশ্যা হিসাবে। তার কামনা ও লালসা সাধারণ সীমাকেও অতিক্রম করেছিল। মহাভারতে আছে–

''ইন্ধন যতই তুমি দাও
আগুন বেড়ে চলবে সীমাহীন
নদী যতই পড়ুক মোহনাতে
সাগর হবে ততই স্ফীতকায়।
যতোই জন্ম গ্রহণ করুক প্রাণী
মৃত্যু তত বাড়াবে তার গ্রাস
যতোই পুরুষ আসুক তার কাছে
মদিরাক্ষীর তৃপ্তি তবু নেই।''

একজন পুরুষ মানুষের পক্ষে কখনোই সম্ভব নয় কামুক নারীর প্রকৃত ক্ষুধা মেটানো। সে নারী সুযোগ পেলেই তার সদ্ব্যবহার করে। পুরুষের পক্ষে তাকে আগলে রাখা খুব কঠিন কাজ। তার যেমন আছে ছলা-কলা, তেমন আছে কলহপরায়ণতা ও অভিমান। এক্ষেত্রে সাহিত্যে দেখা গেছে স্ত্রীর ক্রোধ প্রশমনে স্বামীর নানা প্রয়াস। রামায়নে নম্র প্রভৃতি সীতা যেমন উঠে এসেছে মহাভারতে বজ্রকঠিন দ্রৌপদীও তেমন পঞ্চ স্বামীকে কঠিন তিরস্কার ও শাসন করতে একটুও দ্বিধাগ্রস্থ হননি। নারী কেবল পুরুষের ছত্রতলায় শায়িত ছিল একথা সর্বদা ঠিক নয়। রাজপুত রমনীরা তাদের বীরত্ব সাম্প্রতিককাল পর্যন্ত অটুট রেখেছিল। ব্রিটিশ সেনাপতি হিউ রোজ-ও স্বীকার করতে বাধ্য হয়েছে মহাবিদ্রোহ একমাত্র পুরুষ ছিলেন ঝাঁসীর প্রসিদ্ধ রাণী। আজও গোয়ালিয়রে তাঁর অশ্বারোহে যুদ্ধাভিত্রাসী রণংদেহী স্ট্যাচু সকলকে শিহরিত করে তুলে।

গণিকাদের কথা:

জন্ম মানুষের পরিচয় হয় না, কর্মই তার আসল পরিচয় তুলে ধরে। নারীরাও এর ব্যতিক্রম নয়। যদিও প্রথম পরিচয় তারা নারী। তাদেরও আবার কর্মভিত্তিক বিভাজন ঘটে। এমনকি একটি নারী শ্রেণী গণিকা। এরা সমাজের মূল স্রোতে নিয়মনীতির দ্বারা আবদ্ধ থাকত না। এরা ছিল সমাজের উচ্চবর্ণ বহি:র্ভূত দিন-দু:খী নারী যাদের কাজ ছিল শ্রম দেওয়া, ভিক্ষাবৃত্তি বা অল্পমূল্যে দেহোপজীবনী। কিন্তু সাহিত্যে যে ধরনের গণিকাদের কথা জান যায় তারা ছিল সুশিক্ষিতা, সুন্দরী ও সর্ব্বপরি ধনী। তারা সমাজের অন্যান্য মানুষের তুলনায় খ্যাতির আসনে বসার সুযোগ পেতেন বেশী। জ্ঞানও ছিল টইটুম্বর। বলা যেতে পারে 'চোষট্টি কলাতে' পারদর্শী। নৃত্য সংগীত, রন্ধন বা ঘর সাজানোই নয় অসিচালনা, স্থাপত্য-বিদ্যা, তর্কশাস্ত্র, রসায়ন ও

খনিজতত্ত্ব এবং টিয়া ও ময়নাকে কথা বলতে শেখানোও তার মধ্যে পড়ে। অবশ্য এই চৌষট্টি কলাতে সকলে পারদর্শী ছিল তা বলা যায় না। তাদের জীবিকার পক্ষে উপযোগী কলাগুলিকেই তারা বেশী আয়ত্ত্ব করেছিল। এর মধ্যে সর্বকলাতে অনেকেই পারদর্শীও ছিল। কামসূত্রে বলা হয়েছে, ‘‘তৃপ্তিদায়ক স্বভাববিশিষ্ট, সুন্দরী ও নানা দিক থেকে আকর্ষনীয় যে গণিকা প্রয়োজনীয় বিদ্যাগুলি আয়ত্ত করেছে, ...তার অধিকার আছে পুরুষদের মাঝখানে গিয়ে সম্মানের আসনে বসবার। রাজা তাকে সম্মান দেবেন এবং জ্ঞানী ব্যক্তিরাও তার প্রশংসা করবেন। সবাই তার অনুগ্রহ চাইবে এবং বিবেচনা সহকারে আচরণ করবে তার সঙ্গে।’’ জ্ঞানের মধ্যে দিয়েই তার অধিকার অর্জিত হল , আসতে আসতে সুন্দরের প্রশংসাও বাড়তে থাকল। এ শুধু প্রাচীন ভারতে নয় মধ্য অতিক্রম করে আধুনিক বা সাম্প্রতিক কালেও সেই ধারা অব্যাহত রয়েছে। জাত-কূল-বর্ণে তার পরিচয় থাকল না, তার পরিচয় হয়ে উঠল বিশ্বজনীন। একই সঙ্গে তাদের নামকরণে ঘটে গেল আমূল পরিবর্তন। বৈশালী নগরের অম্বপানী এর প্রকৃষ্ট উদাহরণ। তিনি যেমন ছিলেন ধনী তেমনই ছিলেন ধীশক্তির অধিকারিণী। তাঁর খ্যাতি পরিব্যাপ্ত ছিল ভারতের উন্নত কৃষ্টিসম্পন্ন অঞ্চলগুলিতে। যে নগরে তার বাস ছিল সেই নগরেরই সবচেয়ে মূল্যবান সম্পদ হিসাবে সে বিবেচিত হতেন। এ যেন মানুষের মমি। পর্বত অভিমুখে তাঁর শেষ যাত্রায় বুদ্ধ বৈশালী অতিক্রম করে যেতে যেতে আমন্ত্রিত হয়েছিলেন তাম্বশালীর দ্বারা। নগরপিতারা চেয়েছিলেন এই মোক্ষম সময়েই বৈশালীর পক্ষ থেকে তাঁরা রাজকে সম্বর্ধনা জানাবেন। কিন্তু তা আর তাঁদের হয়ে ওঠেনি। স্বয়ং বুদ্ধও তাঁদের আহ্বানের চেয়ে অধিক আদরণীয় বিবেচনা করেছিলেন অম্বপালীর সেই আমন্ত্রণ।

টিপ্পনী

গণিকাদের রাষ্ট্রীয় স্বীকৃতি ও বিভিন্ন ধরনের বারাঙ্গনা :

আসতে আসতে রাষ্ট্রীয় তত্ত্বাবধান ও দায়িত্বে তারা সুরক্ষিত হয়। সমগ্র বিষয়টি সমাজের মূল স্রোতে (অধিকার ও দায়দায়িত্বে) ক্রমশ আসতে শুরু করে। অর্থশাস্ত্র থেকে জানা যায় বারাঙ্গনাদের জন্য রাষ্ট্রীয় তত্ত্বাবধানে নিযুক্ত করা হয় একজন তত্ত্বাবধায়ক কর্মচারী। তিনি প্রসাদ গণিকাদের দেখাশোনা, গণিকালয়গুলি পরিদর্শন এবং বারাঙ্গনাদের কাছ থেকে কিছু উপার্জিত অর্থ রাজসরকারকে প্রদেয় কর হিসাবে আদায় করতেন। এমনকী তাদের শিক্ষণবিশদেরও রাষ্ট্রীয় আনুকূল্য প্রদান করা হয়েছিল। এদের মধ্যে যে সবাই একই ধরনের হত তা কিন্তু নয়-চোর, দুর্বৃত্ত, ভেকধারী যাদুঘর, নানাধরনের ঠক ও প্রবঞ্চকও ছিল। অবশ্য রাষ্ট্রীয় নিয়ন্ত্রণে ব্যবস্থাটি গড়ে ওঠেছিল বলে ‘গুপ্তচরব্যবস্থা’, সমগ্র বিষয়টিকে পুরোপুরি ঠিক ঠিক নজর-দারিতেই রেখেছিল। কোনো কোনো ক্ষেত্রে গুপ্তচরেরা বারাঙ্গনার সাহায্য নিয়েই যে কোনো বিবাদের মিমাংসা করতে পারতেন। আবার সম্ভাব্য বারাঙ্গনারা উপপত্নীর কাছাকাছি এসে মিশে যেতে পারত। রাজা বা সামন্তবর্গরা বেশ কিছু গণিকাকে তদের রাজপ্রাসাদে স্থান দিতেন অনেকটাই অন্তঃপুরিকার গণিকাদের মতো। এরা অনেকটা বেতনভোগী কর্মচারীদের মতো। এদের কাজও ছিল নানাবিধ। প্রধান কাজ ছিল রাজা বা সামন্তবর্গের পরিচর্যা করা। এদের সামগ্রিক সামাজিক অবস্থা পুরোপুরি জানা যায় না। রাজা বা সামন্তবর্গেরা যখন কোনো গুরুত্বপূর্ণ কাজে প্রাসাদের বাইরে বা রাজ্যের বাইরে যেতেন তখন তারা অন্য সবাসদদের হাতেএদের অর্পণ করে যেতেন। তখন তারা সেইসব সভাসদদের পরিচর্যা করতেন। এদিক থেকে দেখতে গেলে অন্তঃপুরের মেয়েদের মতো এদের সামাজিক আত্মমর্যাদা ছিল না। এরা রাজার সঙ্গে বাইরে যাবার কোনো সুযোগই পেত না।

আর এক ধরনের বারাঙ্গনাদের কথা জানা যায়। এর ধর্মীয় বাতাবরণে তাদের জীবন জীবিকা নির্বাহ করত। মধ্যযুগের ইতিহাসে রাজাকে যেভাবে দেখা হতো প্রাচীন ভারতে মন্দিরের দেবতাকেও সেই একই দৃষ্টিকোণ থেকে দেখার রেওয়াজ প্রচলিত ছিল। আর মন্দিরের দেবতারও থাকত সেই একই ধরনে মন্ত্রী পরিষদ, একাধিক স্ত্রী ও অনুচর বৃন্দের দল। রাজসভার সমস্ত

চরিত্রই প্রতীয়মান ছিল দেবতাকে ঘিরে-এমনকি সেবিকা বারাঙ্গনার দলও। প্রথাগত পদ্ধতির মধ্যে দিয়েও এই ব্যবস্থা পরিচালিত হতো। আবার কোনো কোনো সময় প্রথাগত পদ্ধতি যে অনুসরণ হত তা কিন্তু নয়। অনেক সময় বাইরের বা এই দেবতাকেন্দ্রিক সমাজ বহিঃর্ভূত থেকে শৈশবে কণ্যাকে দেবতার উদ্দেশ্যে অর্ঘ্য হিসাবে তুলে দেওয়া হত। এরা দেবতার বিগ্রহের সেবা করত, নাচতো ও গাইতো তার সামনে এবং রাজ-রাজাদের সেবিকার মতোই তাদের আচরণ নির্ধারিত ছিল। অর্থাৎ রাজারা যেমন তাদের অবর্তমানে অন্য সভাসদদের কাজে গণিকাদের কাজে লাগাতে পারতেন তেমনি এই দেবদাসীরা সেবা করতে বাধ্য থাকত পুরুষ পূজারীদের ও অন্যান্যদের। আমাদের দেশে এই ব্যবস্থা খুব প্রাচীনকাল থেকে দৃঢ়ভাবে সুপ্রতিষ্ঠিত ছিল একথা খুব জোরের সহিত বলা যায় না। কারণ সেসব সাক্ষ্যপ্রমাণাদি খুব একটা বেশি পাওয়া যায় না। আবার অনেকে সাক্ষ্যপ্রমাণাদি ছাড়াই সিন্ধুতীরবর্তী নগরগুলিতে এই প্রথার প্রচলন ছিল এরকম মত ব্যক্ত করেছেন। ধর্মানুমোদিত বেশ্যাবৃত্তির প্রাচীনতম উল্লেখ পাওয়া যায় বারাণসীর ১৬০ মাইল দক্ষিণে বিন্ধ্য পর্বতের অন্তর্গত রামগড় নামক স্থানের একটি গুহায়। এই গুহায় উৎকীর্ণ লেখটি পদ্যছন্দে প্রাকৃত ভাষায় রচিত। এটি বলছে-

টিপ্পনী

''কবিরা হলেন সব প্রেমিকের সেরা,
কামার্ত বুকে আলো তাঁরা জ্বেলে যান।
ঢেঁকিকলে দোলে মধুরহাসিনী বামা,
পরিহাস আর নিন্দার বোঝা বয়ে-
কেমনেতে তার অন্তরে দিল দেখা
গভীর প্রেমের এত বড়ো উচ্ছাস?''

এরপর নিছক গদ্যে তুলে ধরা হয়েছে

''সুতরুণ চিত্রশিল্পী দেবছিন্ন ভালোবেসেছিল দেবদাসী সুতনুকাকে।''

এখানে সেভাবে সুতকার কথা বলতে গিয়ে 'দেবদাসী' শব্দটি যেভাবে ব্যবহৃত হয়েছে; সেভাবে পূর্ববর্তী কোনো লেখতে আর পাওয়া যায় না। মধ্যযুগের আগে দেবদাসীরা থাকলে ভারতবর্ষের সর্বত্র সমানভাবে ছিল না। তুলনামূলক নিরীখে (গণিকা) তাদের অবস্থান ছিল খুবই সামান্য। দক্ষিণ ভারতে এর আধিক্য ছিল চোখ পড়ার মতো। ধর্মীয় উৎসবেও সে রেওয়াজ থেকে গিয়েছিল। প্রাচীন তামিল সাহিত্যে দেখা যায় যে বেশ্যাবৃত্তির বদল প্রচলন ছিল তাদের সমাজে। ফলে ধর্মের অনুমোদন নিয়ে গণিকা-চর্চা দ্রাবিড় সমাজে খুব সহজেই বিস্তার লাভ করে। তবে তার গতি ছিল খুবই শ্লথ।

উপসংহার:

বারাঙ্গনাদের আলোচনায় উঠে এসেছে ভালো ও মন্দ উভয় দিকই। বিভিন্ন তথ্যসূত্রে তাদের উচ্চ প্রশংসা ও আত্মমর্যাদার দিকটিও উঠে এসেছে। তারা যে এ কাজ সম্মানের সাথেই করতে পারত সে কথাও বারংবার উঠে এসেছে। কিন্তু স্মৃতিশাস্ত্রগ্রন্থগুলির লেখকগণ এবিষয়ে দ্বি-মত পোষণ করেছেন। তাঁরা এই বৃত্তিকে জঘন্য হিসাবে প্রতিপণ্য করে বলতে চেয়েছেন তা সমাজের পক্ষে অমঙ্গল ও ক্ষতিকারক। কোনো একটি তথ্যসূত্র থেকে এমন কথাও জানা যায় বেশ্যাকে খুন করলে কোনো পাপ হয় না এবং আইনের চোখে একাজ দন্ডনীয় হওয়া উচিত নয়। সাহিত্যে একটি প্রবাদ আছে ''যারা রক্ষক তারাই ভক্ষক'' ইতিহাসেও সেকথা অন্যভাবে উঠে এসেছে। মধ্যযুগ নাগাদ দেখা যায় যে মনুসংহিতার সমর্থক ব্রাহ্মণেরা নিজেরাই যুক্ত হয়েছেন বিভিন্ন মন্দিরের সঙ্গে যুক্ত শত শত বারাঙ্গনার সঙ্গে। আর রাজ-রাজাদের কথা তো বলার অপেক্ষা থাকে না-সুখের বিষয় ছিল রাষ্ট্রীয় তত্ত্বাবধান ও দায়দায়িত্ব সেই সময়ের নিরীখে

অবশ্যই অপ্রতুল্য।

বিধবাদের প্রসঙ্গে দু-চার কথা :

৪.৩.ক. সূচনা:

প্রাচীন ভারতে বিধবাদের প্রসঙ্গে খুব বেশী আগ্রহ সেই সমাজের ছিল না। তারা ছিল সমাজে অবহেলিত ও অমঙ্গলের প্রতীক। এই ব্যবস্থা মধ্যযুগ নাগাদ মোটামুটি অটুট ছিল। সবশেষে বেদনার বিষয় ছিল যেসব মেয়ে শৈশবেই বিধবা হয়েছে এবং যাদের বিবাহ যৌন মিলন পর্যন্ত পৌঁছতেই পারেনি তাদেরও এর আওতায় আসতে হত। আবার প্রায়শই নারীরা স্বামীর চিতায় আত্মবিসর্জন দিতেন।এতে নাকি 'সতীত্ব' রক্ষা পায়। 'সতী' শব্দটির অর্থ 'পূণ্যবতী নারী'। বিধবাদের পুনর্বিবাহ ব্যবস্থা কেমন ছিল শাস্ত্রে সেকথা জোরের সঙ্গে আলোচিত হলেও বাস্তবে খুব দৃঢ়তার সঙ্গে প্রয়োগ করা হয়নি।

টিপ্পনী

তথ্যসূত্র ও স্মারক স্তম্ভে বিধবাদের চিত্র :

অর্থশাস্ত্রে উল্লিখিত দূর অতীতে বিধবাদের পুনর্বিবাহ প্রায়ই হত। নল-দময়ন্তীর বিখ্যাত পুরাকাহিনীতে দেখা যায় যে নায়ক তার স্ত্রীর কাছ থেকে দীর্ঘকাল বিচ্ছিন্ন থাকার পর আবার তার সঙ্গে মিলিত হন দময়ন্তী কর্তৃক গৃহীত এক কৌশলের সাহায্যে। দময়ন্তী ঘোষণা করে দিলেন যে তিনি ধরে নিয়েছেন তাঁর স্বামী মৃত এবং তাঁর ইচ্ছা আবার নতুন করে স্বয়ম্বর-সভা তাঁর জন্য অনুষ্ঠিত হোক। দুই-একজন অপ্রধান বিধান-দাতার অনুমতি অনুসারে নারী পুনর্বিবাহ করতে পারে যদি তার স্বামী দীর্ঘকাল নিরুদিষ্ট থাকে, মারা যায়, তপস্বীর জীবন গ্রহণ করে, যৌন সংগমে অক্ষম হয় অথবা জাতিচ্যুত হয়। অবশ্য, পরবর্তীকালে র টীকাদারেরা বলেছেন, "কোনো অবস্থাতেই ভদ্রঘরের মেয়েদের দ্বিতীয়বার স্বামী গ্রহণ করার অনুমতি দেওয়া চলে না।" ফলে সমাজের উচ্চশ্রেণীর মানুষেরাই বেশী বিভ্রান্ত হয়েছেন কী করবেন ভেবে না পেরে শেষমেষ দ্বিতীয়ার্ধকেই বাস্তবে রূপ দিয়েছেন। এরূপ প্রেক্ষাপটে বিধবাদের জীবন হয়ে ওঠে একেবারে নি:সঙ্গ ও কষ্টকর। তার জন্য সমাজের বিধান ছিল সম্পূর্ণ আলাদা। আচার-অনুষ্ঠান, পোষাক-সাজসজ্জা, খাবার দ্রব্য ও শয়নে তার জন্য পৃথক বিধান মেনে চলা ছিল একেবারেই বাধ্যতামূলক। শয্যা পাততে হত তাকে ভূমিতে এবং আহার বরাদ্দ ছিল একবেলা। সে আহার ছিল মধু, মাংস ও লবণবর্জিত। অলঙ্কার ধারণ করা বা রঙীন বস্ত্র পরা বা সুগন্ধী ব্যবহার করা ছিল তার পক্ষে একেবারে নিষিদ্ধ। তাকে দিন কাটাতে হতো পূজা-অর্চনার মধ্যে দিয়ে। এর অন্যথায় জন্মান্তরে চরম দুঃখ পেতে হবে বলে মনে করা হত। এছাড়া, তাঁর নিজ পুত্রকণ্যাদের কাছে ছাড়া প্রত্যেকের কাছেই তাকে অশুভ উপস্থিতি হিসাবে প্রতিপন্ন করা হতো। এমনকী পারিবারিক উৎসবেও তিনি যোগদান করতে পারলেন না। দুর্ভাগ্যের মূর্ত প্রতীক মনে করে তাঁকে পরিহার করে চলত এমন কি বাড়ির ভৃত্যরাও। এইভাবে তাঁর জীবন হয়ে উঠেছিল একেবারে দুর্বিষহ।

এরকম পরিস্থিতিতে নারীর আত্মবিসর্জন ছাড়া আর কোনো গতন্তর ছিল না। সতীত্ব রক্ষা তাঁর কাছে তখন অনেক সহজ হয়ে গেল পাশবিক সমাজের জাতাকলে পৃষ্ঠের তুলনায়। স্বামীর চিতানলে বিধবার আত্মাহুতির প্রাচীনতম উল্লেখ আমরা পাই আলেকজাণ্ডারের ভারত আক্রমণ বিষয়ক গ্রিক বিবরণে। রামায়ণ-মহাভারতে দু-একটি সতীদাহের ঘটনা আছে। সতীদাহের প্রথম স্মারকচিহ্ন পাওয়া যায় মধ্যপ্রদেশের সাগরের কাছে এরণ নামক স্থানে। সেখানে এক স্তম্ভের গায়ে উৎকীর্ণ রয়েছে এক বীরপুরুষ ও তাঁর পত্নীর বেদনাজনক অবসানের কথা। সে কথা লিপিবদ্ধ রয়েছে পদ্যছন্দে যার সংক্ষিপ্ত ও সরল রূপটি ঠিক যেন ভারতীয় নয়। পড়লে মনে আসে সমাধিস্তম্ভে উৎকীর্ণ শোকলিপির যে সব নমুনা গ্রিক কাব্য-সঙ্কলনা দিতে

পাওয়া যায় তাদের কথা। ঐ স্মারক স্তম্ভে বলা হয়েছে:

"পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ বীর ভানুগুপ্ত আগত হেতায়
মহান নৃপতি তিনি বীর্যবান অর্জ্জুনের মতো
লোপরাজা অনুবর্তী পশ্চাতে তাঁহার
প্রিয় সখা থাকে যথা সর্বদা সাথেতে।"

"অধিনেতাদের সেরা সেই বীর নিজেকে আহুতি দিয়ে
সকলের জানা মহাসংগ্রামে স্বর্গে প্রয়াত হন।
পত্নী যে তাঁর প্রেমের আধার পরম পতিব্রতা
স্বামী সোহাগিনী সুন্দরী হেতা জ্বলন্ত চিতানলে
প্রবেশ করেন নির্ভীক চরণেতে।"

টিপ্পনী

এছাড়া আধুনিক সাহিত্যে জ্বলন্ত চিতায় বিধবার আত্ম-জ্বালার মর্মস্পর্শী দিকটিও উদ্ঘাটিত হয়েছে সত্যেন্দ্রনাথ দত্তের 'সহমরণ'-এ। সে সেই সমাজে আর এক জননীর কাছে পুড়ে যাওয়া গায়ে তীব্র যন্ত্রণার কথাই ব্যক্ত করেছেন।

উপসংহার :

এসব কিছুর মধ্যে দিয়ে একথা প্রতীয়মান যে স্বামীর পরিবার তথা সমাজে বিধবা ছিল অলক্ষণের বোঝা। তাঁর বিধানগুলি এমনভাবে রচিত ছিল যেন তা লঙ্ঘন করলেই স্বামীর আত্মার অমঙ্গল ঘটবে। অল্প বয়সের মেয়েরা এসব কিছু বোঝার আগেই তাদের যেকোন বিধানই শ্রেয় মনে হয়েছিল। কিন্তু প্রাপ্তবয়স্কা বিধবারা সমাজের জাতাকলে পৃষ্ঠের চাইতে স্বামীর সঙ্গে পুনর্মিলিত হবার আশা নিয়ে মৃত্যুবরণ অধিকতর গ্রহণযোগ্য মনে করেছিলেন। তাত্ত্বিক পরিপ্রেক্ষিতে যতই সম্পূর্ণ স্বেচ্ছার কথা বলা হোক বাস্তব পরিপ্রেক্ষিত ছিল এটাই। ইউরোপীয় ভ্রমণকারীদের চোখে নিন্দনীয় এই প্রথাকে মাত্র উনবিংশ শতাব্দীতে আইনের দ্বারা রদ করা হয়েছে।

প্রশ্নাবলী

১. প্রাচীন ভারতে নারীদের অবস্থা সম্পর্কে পর্যালোচনা করুন।

২. অর্থশাস্ত্রের আলোকে নারীর প্রকৃত অবস্থা কেমন ছিল?

৩. প্রাচীন ভারতে গণিকাদের সম্পর্কে আপনি কী জানেন?

৪. প্রাচীন ভারতে বিধবাদের প্রসঙ্গে আলোচনা করুন।

৫. আপনি কী মনে করেন প্রাচীন ভারতে নারীদের অবস্থা ভালো ছিল?

গ্রন্থপঞ্জী:

১. A.L.Bashan, 'The Wonder that was India' প্রসিদ্ধ গ্রন্থের বাংলা অনুবাদ । ভূমিকা ব্রতীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়, অনুবাদ-অংশুপতি দাশগুপ্ত। এর থেকেই মূল আলোচনা উপস্থাপিত হয়েছে।

২. S.A.A.Rizvi-'The Wonder that was India'. বাংলা অনুবাদ

৩. B.N.Luniya:Evolution of Indian Culture (Laxmi Narayan Agarwal)

৪. Sysic Tharur and K.Lalita-Woman Writing in India.

সংক্ষিপ্ত :

১. অর্থশাস্ত্র কে রচনা করেন?

২. সীতা কে?

৩. মহাভারতে কোন মহিলা ব্রজ্যকঠিন?

৪. গণিকা কারা?

৫. প্রাচীন ভারতে কয়েকজন নারীর নাম উল্লেখ করুন।

৬. অশ্বপালী কে ছিলেন?

৭. বারাঙ্গনা বলতে কী বোঝেন?

৮. 'দেবদাসী' কী?

টিপ্পনী

- প্রাচীন ভারতে নারীর অবস্থা সম্পর্কে জানার উপাদান – বেদ, বৈদিক সাহিত্য, রামায়ণ, মহাভারত, পুরাণ, গ্রিক পর্যটক ও ঐতিহাসিকদের বিবরণ, অর্থশাস্ত্র, বৌদ্ধ ও জৈন গ্রন্থ প্রভৃতি।
- ঋক-বৈদিক যুগে – বাল্যবিবাহ ও সতীদাহ প্রথা ছিল না।
- অঙ্গুওরনিকায় – বৌদ্ধগ্রন্থ।
- বৌদ্ধ ও জৈন উচ্চশিক্ষিত নারী – চন্দনা, জয়ন্তী, ধর্মদিক্ষা, মহাপ্রজাপতি প্রমুখ।
- গুপ্তযুগে শাসনকার্যে নারী – প্রভাবতী গুপ্তা।
- 'সদ্যোদবাহ' – যে সব নারী বিবাহের পূর্ব পর্যন্ত বিদ্যাচর্চা করতেন, তাঁদের বলা হত 'সদ্যোদবাহ'।
- 'ব্রহ্মবাদিনী' – যাঁরা বিবাহ না করে আজীবন বিদ্যাচর্চা করতেন, তাঁরা 'ব্রহ্মবাদিনী'।
- 'পন্ডিতা' – মহাভারতের দৌপদী।
- 'গাথা-সপ্তশতী' – হাল রচিত সাতজন মহিলা কবির কবিতা সংকলন।
- 'শক্তিমুক্তাবলী' গ্রন্থ – রাজশেখর (এতে তিনি তিনজন মহিলা কবির প্রশংসা করেছেন।)
- কহ্লনের রাজতরাঙ্গিনীতে দুই বীরাঙ্গনা – সিল্লা ও চুড্ডা।
- শাসনকার্যে নারী – নয়নিকা, প্রভাবতী, বিজয় ভট্টারিকা, সুগন্ধা, সিদ্দা, সূর্যমতী, ত্রিভুবন মহাদেবী, ধর্মমহাদেবী, বকুল মহাদেবী, চন্ডী মহাদেবী, দেবী গোস্বামিনী প্রভৃতি।
- সম্রাট আশোকের দ্বিতীয়া পত্নী – কারুবাকি।

- ঋক-বৈদিক যুগে উচ্চশিক্ষিত নারী – ঘোষা, অপালা, বিশ্ববারা, মমতা, লোপামুদ্রা প্রভৃতি।
- 'সাধারণী স্ত্রী' – গণিকা।
- পরবর্তী বৈদিক যুগের কৃতী নারী – গার্গী, মৈত্রেয়ী।
- অর্থশাস্ত্রে আটপ্রকার বিবাহ – ব্রাহ্ম, দৈব, আর্য, প্রাজাপত্য, আসুর, গান্ধর্ব, রাক্ষস এবং পৈশাচ।

পর্যায় ২.১. জৈন ও বৌদ্ধ ধর্ম

টিপ্পনী

একক ২.১.০. প্রতিবাদী ধর্মের উদ্ভব

একক ২.১.১. জৈন ধর্ম

- সূচনা
- জৈন ধর্ম-মৌখিক থেকে মতবাদ
- দ্বৈতসত্ত্বা ও মুক্তিলাভের পথ
- ত্যাগ ও পবিত্রতা
- সাম্প্রতিক অবস্থা
- রাজকীয় পৃষ্ঠপোষকতালাভ
- জৈন ধর্মের দুটি ধারা/ বিভক্তিকরণ
- জৈন ধর্মের প্রভাব

একক ২.১.১. বৌদ্ধ ধর্ম

- সূচনা
- বুদ্ধ ও তাঁর ধর্মমত
- মহাবীর ও গৌতমবুদ্ধ
- রাষ্ট্রীয় পৃষ্ঠপোষকতালাভ
- বৌদ্ধ ধর্মের প্রভাব

একক ২.১.১. উভয় ধর্মের সাদৃশ্য

২.১. জৈন ও বৌদ্ধ ধর্ম

২.১.০ প্রতিবাদী ধর্মের উদ্ভব:

৬০০ খ্রিষ্টপূর্বাব্দ নাগাদ উত্তর ভারতে বিভিন্ন রাজ্য ও গণরাজ্য স্থাপনের মধ্যে দিয়ে ভূমিই আর একমাত্র অর্থাগমের উপায় থাকল না। এর কয়েক শতাব্দীর মধ্যেই বিশেষত উত্তরভারতের অর্থনীতিতে শিল্প ও ব্যবসাবাণিজ্য আর একটি অর্থাগমের বিকল্পের স্থান এনে দেয়। অবশ্য, এর মূলে ছিল ছোট ছোট নগরের পত্তন। এরকম কয়েকটি নগর-শাবস্তী, চম্পা, রাজগৃহ, অযোদ্ধা, কৌশাম্বী ও কাশী গাঙ্গেয়-সমভূমির অর্থনীতিতে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ স্থান নিয়েছিল। এছাড়াও বৈশালী, উজ্জয়িনী, তক্ষশিলা অথবা কারুকাজ (ব্রোচ) বন্দরের অর্থনৈতিক গুরুত্ব ছিল আরো বিস্তৃত। ভারতবর্ষের ইতিহাসে নগরায়নের পর্যায়গুলি পর্যালোচনা করলে দেখা যায় এটিই ছিল দ্বিতীয় পর্যায়। এই পর্যায়েই গ্রামীণ কুটির শিল্প-মৃৎ, বস্ত্র বা কাঠ এসবের কারিগরেরা সঙ্ঘবদ্ধ হয় এবং পৃথক পৃথক নির্বাচিত স্থানে বিশেষত উপাদেয় সামগ্রীর ব্যাপারে তারা ক্রমশই উন্নীত হতে শুরু করল। যেমন মৃৎশিল্পের ব্যাপারে শিল্পীরা স্বভাবতই এমন একটি

জায়গা খুঁজে নিল যেখানে ঠিক ধরনের মাটি পাওয়া যায়। আবার কারিগরেরা একসঙ্গে থাকায় তাদের সঙ্গে যোগসাদৃশ ব্যবসায়ী ও সংযুক্ত বাজারের যোগাযোগও সুবিধাজনক হয়। আসে উন্নয়নের জোয়ার, ঘটে গণরাজ্যের সমৃদ্ধি। কাশী, কোশল, মগধ ও বৃজি রাজ্য চতুষ্টয়ের মধ্যে রাজনৈতিক প্রাধান্য বিস্তারের সংগ্রাম চলল প্রায় ১০০ বছর ধরে। শেষপর্যন্ত জয় ঘটল মগধের। আর এর পরবর্তী কয়েক শতাব্দী ধরে উত্তর-ভারতের রাজনীতির মূল কেন্দ্র হয়ে রইল মগধ। এবার ফিরে আসা যাক উত্তর-পশ্চিম ভারতের দিকে। খ্রিস্টপূর্ব ষষ্ঠ শতাব্দীতে ভারতের বাকি অংশ থেকে এই অঞ্চল প্রায় বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ে। বলা যেতে পারে পারস্য সভ্যতা ও সংস্কৃতির সঙ্গেই এই অঞ্চলের ঘনিষ্ঠতা বৃদ্ধি পায়। আনুমানিক খ্রিস্টপূর্ব ৩৩০ সাল নাগাদ ম্যাসিডনের রাজা আলেকজান্ডারের পারস্য জয়ের পরে উত্তর-পশ্চিম ভারতের ওপর পারস্যের আধিপত্যের পরিসমাপ্তি ঘটেছিল। আলেকজান্ডার এই অঞ্চল জয় করলেও এদেশে তার অভিযানের কোনো উল্লেখযোগ্য রাজনৈতিক বা সামরিক প্রভাব পড়েনি। আর তার প্রস্থানের পর এসব অঞ্চলে যে রাজনৈতিক শূন্যতার সৃষ্টি হয়েছিল চন্দ্রগুপ্ত মৌর্য সেই অবস্থার সদ্ব্যবহার করেছিলেন ওই সমস্ত ছোট ছোট রাজ্যগুলিকে মৌর্য সাম্রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত করে নেওয়ার মধ্যে দিয়ে। একই সঙ্গে উত্তর-পশ্চিম ভারত ও পশ্চিম এশিয়ার মধ্যে ব্যবসা-বাণিজ্যের সম্ভাবনার ফলে শহরগুলির শ্রীবৃদ্ধিও ঘটেছিল। এছাড়া এমন কিছু প্রত্নসামগ্রী পাওয়া গেছে যেগুলি থেকে প্রতীয়মান হয় যে এই সময় থেকেই উত্তর-দক্ষিণের যোগাযোগ ঘনিষ্ঠ হয়ে ওঠে। পূর্বের ন্যায় এবারেও শহরের প্রসারলাভের সঙ্গে সঙ্গে কারিগরদেরও সংখ্যা বেড়ে গেল। কিন্তু শহরের বিস্তার কারিগরদেরও সংখ্যা বেড়ে গেল। কিন্তু শহরের বিস্তার, কারিগরদের সংখ্যাবৃদ্ধি, ব্যবসা-বাণিজ্যের প্রসার-এই সমস্ত সামাজিক ও অর্থনৈতিক পরিবর্তনের যোগাযোগ ছিল আর একটি বিষয়ের সঙ্গে। তা হল ধর্ম ও দার্শনিক চিন্তাভাবনা।

বৈদিক যুগে ব্রাহ্মণ্যবাদের প্রাধান্য ও তাঁদের নিয়ম নীতি সমাজের সকল স্তরের মানুষের জন্য সমানভাবে প্রযোজ্য হয়নি। এখানে কেবল ব্রাহ্মণ ও ক্ষত্রিয়দের প্রাধান্যই সুপ্রতিষ্ঠিত ছিল। এবং একইসঙ্গে যজ্ঞ সমাজের দুই উচ্চবর্ণ, ব্রাহ্মণ ও ক্ষত্রিয়ের জীবনের সঙ্গে ওতোপ্রোত জড়িয়ে গিয়েছিল। ক্ষত্রিয়েরা যুদ্ধকে তাঁদের জীবনের একমাত্র অঙ্গীকার বলে মনে করতেন। আর ব্রাহ্মণের কাছে এই যজ্ঞ ছিল জীবনের প্রধান কর্তব্য এবং জীবিকার্জনের মুখ্য উপায়। সমাজের অপর দুই শ্রেণী, বৈশ্য ও শূদ্রদের কাজ ছিল উদ্বৃত্ত উৎপাদন করা, যে উদ্বৃত্ত উৎপাদন বর্ণাশ্রমের প্রথম দুই শ্রেণী নিজের জন্মগত অধিকার বলে অনায়াসে পেয়ে যেত। কিন্তু যুগের পরিবর্তন ঘটেছে-সামাজিক রীতি নীতির নয়। সমষ্টি মালিকা থেকে এসেছে ব্যক্তি মালিকানা। সম্পত্তি হারানোর ভয় প্রত্যেকেরই রয়েছে-বিশেষত বৈশ্য বা শূদ্রদের। এমতাবস্থায় চিরায়ত বৈদিক ধর্মের বিরুদ্ধে দু'ই ধরনের প্রতিক্রিয়া গড়ে ওঠে। একটা বৈদিক দেব-দেবী ও ব্রাহ্মণ্যবাদের বিরুদ্ধে নাস্তিক মতাবলম্বী। অপরটি গড়ে ওঠে ভক্তিমার্গের মধ্যে থেকেই সত্যের অনুসন্ধিৎসু আস্তিক মতাবলম্বী। আর এর সঙ্গে যুক্ত দার্শনিক চিন্তাভাবনা মানুষের মননে মৌলিক চিন্তাধারার প্রাচুর্য ঘটালো। এই সমস্ত কিছুর মধ্যে থেকে প্রচলিত ধর্মমতের বিরুদ্ধে যে প্রতিক্রিয়া গড়ে ওঠে তা প্রতিবাদী ধর্মান্দোলন নামে খ্যাত। বৌদ্ধ ও জৈন ধর্ম বৈদিক দেব-দেবীকে অস্বীকার করেছিল, তাই এদের বলা হয় প্রচলিত ধর্মমত বিরোধী।

২.১.১ জৈনধর্ম:

সূচনা:

জৈন ধ্যান ধারণার প্রচার চলেছিল খ্রিস্টপূর্ব সপ্তম শতাব্দী থেকেই। প্রায় কয়েকশ বছর এর কোন স্পষ্ট রূপ ছিল না। কিন্তু পরবর্তী শতাব্দীতে মহাবীর সেগুলিকে একটা স্পষ্টরূপ দিলেন। 'জৈন' শব্দটি এসেছে 'জিন' শব্দ থেকে অর্থাৎ বিজেতা বা জয়ী। এখানে বিজেতা

টিপ্পনী

মানে মহাবীর। আনুমাণিক খ্রিঃ পূ: ৫৪০ অব্দে বর্ধমান মহাবীরের জন্ম হয়। জন্মসূত্রে তিনি মুষ্টিমেয়ের শাসনাধীন ক্ষত্রিয়গোষ্ঠীর সঙ্গে সম্পর্কিত। তাঁর পিতা সিদ্ধার্থ কুন্দপুরের জ্ঞাতৃক গোষ্ঠীর নেতা ছিলেন। মা ত্রিশলা ছিলেন লিচ্ছবিদের নেতা চেতকের বোন। উত্তরাধিকারসূত্রে যোগ্য শিক্ষাই তিনি পেয়েছিলেন। যশোদা লক্ষী এক মহিলার সঙ্গে তাঁর প্রণয় ঘটেছিল। এক কণ্যার পিতা সত্ত্বেও মুক্তির উপায় অনুসন্ধানই তাঁর জীবনের প্রধান ব্রত হয়ে ওঠেছিল। মহাবীর তাঁর ৩০ বছর বয়সে (সম্ভবত খ্রিষ্টপূর্ব ৫১০ সালে) সংসার ত্যাগ করে সন্ন্যাস গ্রহণ করেছিলেন।

জৈনধর্ম-মৌখিক থেকে মতবাদ:

বেদের ন্যায় জৈনধর্মের উপদেশাবলী প্রথমদিকে মৌখিকভাবেই সংরক্ষিত হয়েছিল। খ্রিস্টপূর্ব তৃতীয় শতাব্দী নাগাদ এগুলি সংগ্রহ করে লিপিবদ্ধ করা হয়েছিল। সর্বশেষ সম্পাদনার কাজ সম্পন্ন হয় খ্রিষ্ট্রীয় পঞ্চম শতাব্দীতে। এই ধর্ম মতবাদ অনুযায়ী ঈশ্বরের অস্তিত্বের কথা প্রায় কল্পনা করাই হয়নি। এদের বিশ্বাস ছিল জগৎ এক চিরন্তন নিয়মেই আবর্তিত হচ্ছে। আর সমস্ত কিছুর কেন্দ্রবিন্দুতে স্থিত আত্মা। এই আত্মাকে পবিত্র করে তোলাই জীবনের উদ্দেশ্য। এর থেকে প্রতীয়মান হয় যে সব আত্মাই কিন্তু পবিত্র নয়। উপনিষদে যেমন বলা হয়েছে জ্ঞানের মধ্য দিয়েই আত্মার পবিত্রতা আসে। অবশ্য, জৈন মতবাদে এই বক্তব্য স্বীকার করা হয় না; কেননা জ্ঞান সর্বদাই আপেক্ষিক। জৈন মতবাদ অনুযায়ী বিশ্বসৃষ্টির রহস্য ও রক্ষার জন্য কোন দৈব অনুগ্রহ নেই। সার্বজনীন বিধানই এই বিশ্বকে নিয়ন্ত্রণ করে 'বিশ্ব অনন্ত'। পর্যায়ক্রমে উত্থানের পরে আসে পতন এবং উন্নতির পরে ঘটে চলে অবনতি। এদের বিধানের বিশ্বাস অনুযায়ী দেখা যায় প্রতিটি পর্যায়ে ২৪ জন তীর্থঙ্কর, ১২ জন রাজচক্রবর্তী এবং ৬৩ জন মহাপুরুষ জন্মগ্রহণ করেন। উন্নতির চরম পর্যায়ে দেখা যায় মানুষের আয়ু ও আকৃতি বহুগুণ বৃদ্ধি পায়। এই সময় তার আইনশৃঙ্খলা বা সম্পত্তির আর প্রয়োজন থাকে না। সে তার কল্পবৃক্ষের কাছে যা চায়, তাই পায়।

দ্বৈত সত্ত্বা ও মুক্তিলাভের পথ:

জৈনধর্মে দ্বৈতসত্ত্বা জীব ও অজীব সমানভাবে গুরুত্ব পেয়েছে। এই দুইয়ের মধ্যে বিভেদ বা সীমারেখা তারা টানেননি। তাদের কাছে জীব শব্দটির দ্যোতনা আধ্যাত্মিক এবং অজীব শব্দটি দ্যোতনা বাস্তব। তাই তাদের মনে হয়েছে জীব ও অজীবের ক্রিয়া প্রতিক্রিয়াক মধ্য দিয়ে বিশ্বজগতের যাবতীয় কার্যাবলী ঘটে চলেছে। কিন্তু ব্যাপকতার দিক থেকে দেখলে বোঝা যায় জিনরা জীবের অস্তিত্বে বিশ্বাসী। তাদের দৃষ্টিতে জীব সর্বত্র বিরাজমান এমনকী অপ্রাণীজগৎ-এ একইভাবে রয়েছে। বস্তুর অনুযঙ্গে তারা ভিন্ন হলেও তারা সকেলই সমান। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য অপ্রাণীজগৎ বলতে পাহাড়, পর্বত, নদী, স্রোত ইত্যাদিকেও বোঝানো হয়েছে। এই সমস্ত জায়গাতেও জীব উজ্জ্বল, সর্বজ্ঞ এবং পরম সুখের আকর। জৈন বিধানে বস্তুর অনুষঙ্গেই জীব ভিন্ন হয়ে যায়-এই বস্তু হল কর্ম। তাই মানুষের জীবনে কর্মেরও অন্ত নেই। কর্মের ক্রমশ ঘটে চলে বিবর্তন। এমনকী সংসার জীবনেও। একটি জন্মের পর তাই সে অন্য জন্ম লাভ করতে পারে। এই কর্মবন্ধন ছিন্ন করে সংসারবন্ধন থেকে নিষ্কৃতি পাওয়া খুব একটা সহজসাধ্য নয়, অনেকের পক্ষে একেবারেই অসম্ভব। তবে মুক্তির পথ রয়েছে, যা খুবই দুরুহ। এর জন্য প্রয়শ্চিত্ত এবং সংযত জীবনযাপন প্রয়োজন। আর এই জীবনযাপন বিশেষত গৃহীর পক্ষে দু:সাধ্য। একমাত্র মঠ জীবন যাপনেই সে পথে উত্তীর্ণ হওয়া সম্ভব। এখানেই প্রায়শ্চিত্ত ও সংযমের দ্বারা দু:সাধ্য ব্রত পালন করে মুক্তিলাভের মধ্য দিয়ে নির্বানপ্রাপ্তি ঘটে। তখন তার স্থান হয় দেবতার উর্দ্ধে, কেননা দেবতা কর্মের অধীন, কিন্তু সে নয়। তাই জৈনধর্মে মঠ-জীবনের উপর বিশেষ গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে।

টিপ্পনী

ত্যাগ ও পবিত্রতা:

এসব কিছুর মধ্য থেকেই জৈনদের সাধনা একান্তভাবে হয়ে দাঁড়াল ত্যাগ ও পবিত্রতা। মহাবীরের বক্তব্যে উঠে এসেছে দেহ, গৃহ, সম্পদ, স্ত্রী, পুত্র, মিত্র এবং শত্রু–সবই জীব থেকে আলাদা একমাত্র নির্বোধ মানুষই এদের নিজের বলে ভাবে। এরা ঠিক কেমন সেকথা জানানোর জন্যে তিনি একটি সুন্দর উপমা তুলে ধরেছেন। বলেছেন, এরা নানা দিক থেকে উড়ে আসা পাখির মতো, যারা সন্ধ্যায় একই বৃক্ষশাখায় আশ্রয় নেয় এবং ভোর হলে আপন খেয়ালে ভিন্ন ভিন্ন দিকে চলে যায়। এই উপমের কবিতাটিতে তিনি জরা, মৃত্যু সবকিছুকেই প্রবলভাবে অস্বীকার করেছেন। তিনি বলেছেন মৃত্যু আমার জন্যে নয়, তাহলে আমি বর পাব কেন? রোগও আমার জন্য নয়, তাহলে আমি নিরাশ হব কেন? আমি শিশু নয়, যুবক নই, বৃদ্ধ নই। এসবই আমার শরীরের বিভিন্ন অবস্থা। শরীর মাত্রই এসবের মুখোমুখি হবে। সবাই তা অতিক্রম করতে পারে না। জৈনরা অহিংসাকেও মাত্রতিরিক্ত গুরুত্ব দিয়েছেন। তাদের কাছে অজ্ঞানেও কীট–পতঙ্গ বা পিঁপড়ে হত্যা করাও পাপ হিসাবে পরিগণিত করা হয়েছে।

টিপ্পনী

সাম্প্রতিক অবস্থা:

জৈনদের বিধান অনুযায়ী এই জগৎ সংসারে এমন অবনতি পর্ব চলছে। তাদের হিসাব অনুযায়ী শেষ তীর্থঙ্করের নির্বাণলাভের সঙ্গে সঙ্গে এখান থেকে প্রকৃত ধর্ম লুপ্ত হয়ে গেছে। এই অবনতি ৪০,০০০ বছর ধরে চলতে থাকবে। সভ্যতার ঊষালগ্নের পরিস্থিতি আবার ফিরে আসবে ক্রমিক অবক্ষয়ের মধ্যে। গুহাবাসী মানুষের জীবন ছিল যেরূপ ঠিক সেরূপই সে আবার ফিরে যাবে সেই পর্যায়ে। ঘটে যাবে সংস্কৃতির অবক্ষয়। একই সঙ্গে মানুষের পরিবর্তন ঘটবে আকৃতি-প্রকৃতি ও চিন্তাশক্তির ও। এমনকী সে আগুন জ্বালাতেও ভুলে যাবে। সে হয়ে উঠবে গুহাবাসী ও শিকারী বা খাদ্যসংগ্রাহক। আশার আলো এই সে প্রলয় নয়, ক্রমিক বিবর্তনে আবার ঘটে চলবে উন্নতির ধারাবাহিক বিবর্তন।

রাজকীয় পৃষ্ঠপোষকতালাভ:

প্রতিবাদী ধর্মের উদ্ভবে দেখা গেছে নগর ও নাগরিকের বিকাশে ধর্মের ভূমিকা ছিল অবিচ্ছেদ্য। ঠিক একইভাবে প্রতিবাদী ধর্মের বিকাশেও নগরপতিদের ভূমিকা কম ছিল না। কেননা কোন ধর্মই রাষ্ট্র কর্তৃক স্বীকৃত না হলে মানুষের মননে খুব একটা জায়গা করে নিতে পারে না। এরপর আসে তার বিস্তারের পালা। এক্ষেত্রেও জৈনধর্ম ব্যতিক্রম নয়। প্রথম দিকে জৈন ধর্ম খুব একটা বিস্তারলাভ করেনি। প্রধানত মগধ, কোশল, বিদেহ ও অঙ্গ'র মধ্যে সীমাবদ্ধ ছিল। সংখ্যাগত দিক থেকেও তারা আজিবিকদের তুলনায় কম ছিল। যদিও এই সময় বিম্বিসার ও অজাতশত্রু এই ধর্মের পৃষ্ঠপোষকতা করেছিলেন তবুও তা খুব একটা বিস্তারলাভ করেনি। চন্দ্রগুপ্ত মৌর্য তাঁর জীবনের শেষ দিকে এই ধর্ম গ্রহণ করেছিলেন। এছাড়া কলিঙ্গরাজ খারকেলও ছিলেন জৈন।

জৈনধর্মের দুটি ধারা / বিভক্তিকরণ :

প্রাকৃতিক কোন ঘটনাবলী ধর্মের ওপরে কী প্রভাব ফেলতে পারে তার একটি অন্যতম দৃষ্টান্ত হল জৈনধর্ম। তখন চন্দ্রগুপ্ত মৌর্য শাসন ক্ষমতায় বা বলা যেতে পারে তার রাজত্বের শেষ দিক-আর এই সময়েই ঘটেছিল ভয়াবহ দুর্ভিক্ষ। দেখা গেল বহু জৈন সন্ন্যাসী সঙ্গাতীর ত্যাগ করে দাক্ষিণাত্যে চলে আসেন। তাঁদের এই অভিপ্রয়াণকে (বা চলে আসা) কেন্দ্র করে জৈনদের মধ্যে দুটি সম্প্রদায়ের সৃষ্টি হয়। অভিপ্রয়াণকারীদের নেতা ছিলেন ভদ্রবাহু। তিনি

মহাবীরের অনুশাসন সম্পূর্ণভাবে মেনে চলে জৈনদের সম্পূর্ণ নগ্নতাকেই সমর্থন করেন। ফলস্বরূপ, তিনি এবং তাঁর অনুচরগণ দিগম্বর নামে পরিচিত হন। অপরদিকে উত্তর ভারতে যেসব জৈনরা থেকে গিয়েছিল তাঁদের নেতা ছিলেন স্থুলভদ্র। তিনি চেয়েছিলেন মহাবীরের পূর্ববর্তী তীর্থঙ্কর পার্শ্বনাথের অনুশাসন অনুযায়ী শ্বেতবস্ত্র পরিধান করতে। তাই তিনি এবং তার সমর্থগণ শ্বেতাম্বর নামে পরিচিত হন। তাত্ত্বিক দিক থেকে পৃথক পৃথক পথ হলেও, ধর্মের মূল নীতি সম্পর্কে উভয় এবং উভয় সম্প্রদায়ের পরিবর্তন ও পরিমার্জন ঘটেছিল। অনেক সময় বেশকিছুরই পরিবর্তন ও পরিমার্জনে নতুন গতি সঞ্চারিত হয়। কিন্তু জৈন ধর্মের ক্ষেত্রে তেমন আমূল পরিবর্তন লক্ষ্য করা যায়নি। কেননা, মৌর্য এবং গুপ্তযুগের মধ্যবর্তী সময়ে জৈনধর্ম মোটামুটিভাবে পূর্বে ওড়িশা থেকে পাশ্চিমে মথুরা পর্যন্ত বিস্তার লাভ করেছিল। আর পরবর্তীকালে এই ধর্ম প্রধানত কাথিয়াবাড়, গুজরাট এবং রাজস্থানের অংশবিশেষে কেন্দ্রীভূত হয়। এই অঞ্চলে তখন শ্বেতাম্বরদের প্রাধান্য ছিল। অন্যদিকে, দাক্ষিণাত্যে, মহীশূর এবং দক্ষিণ হায়দ্রাবাদে প্রাধান্য ছিল দিগম্বরদের। আর এক কয়েক শতাব্দী পরে চালুক্য বংশীয় নৃপতি কুমারপালের রাজত্বকালে পশ্চিমভারতে শ্বেতাম্বর জৈনগণ বিশেষ গুরুত্ব অর্জন করেছিল। এক্ষেত্রে দেখা গেছে প্রখ্যাত জৈন পন্ডিত হেমচন্দ্রের একটি দীর্ঘ প্রয়াস-বিশেষত এই ধর্মের সংস্কার সাধনে। কিন্তু তাঁর মৃত্যুর পর এই সম্প্রদায়ের মর্যাদা, বিশেষভাবে হ্রাস পায়। অনুরূপভাবে রাজাদের আনুকূল্যে দাক্ষিণাত্যে দিগম্বর সম্প্রদায়ের প্রভাব বিশেষভাবে বেড়েছিল। কিন্তু সেই প্রভাব দীর্ঘ-স্থায়ী হয়নি। শৈব ও বৈষ্ণব ধর্মের অগ্রগতির সঙ্গে সঙ্গে সেই প্রভাব দ্রুততার সঙ্গে ক্ষুন্ন হয়ে যায়। সর্বভারতীয় স্তরে জৈন ধর্মের অবনতি ঘটলেও এদেশ থেকে এই ধর্ম কখনও লোপ পায়নি। প্রায় দু'হাজারের বেশি শক ভারতের জনসমষ্টির একটি উল্লেখযোগ্য অংশ জৈন থেকে গেছে। একটা কথা আমাদের মনে রাখা দরকার যে, যে কারণে জৈনধর্ম ভারতের বারিরে যেতে পারেনি, সেই কারণেই তা ভারতের ভিতরে বেঁচে আছে। এই হল সেই কারণ যা কিনা জাতিভেদ এবং ধর্মীয় আচার-অনুষ্ঠানের ব্যাপারে এই ধর্ম হিন্দুধর্মের সঙ্গে আপস করেছে। অবশ্য, এ. এল. বাসাম বলেছেন, একমাত্র কঠোর অনুশাসনই জৈনধর্মকে এতদিন বাঁচিয়ে রেখেছে।

টিপ্পনী

<u>জৈন ধর্মের প্রভাব</u>ঃ

ভারতীয় সমাজজীবন ও সংস্কৃতিতে জৈনধর্মের অবদান খুব একটা কম নয়। অর্থনীতির ক্ষেত্রে দেখা যায় বৌদ্ধধর্মের মতো জৈনধর্মও বাণিজ্যিক গুণাবলী, সততা এবং মিতব্যয়িতাকে উৎসাহ দিয়েছেন। ফলস্বরূপ, এই ধর্ম দ্রুত ব্যবসায়ীদের মধ্যে প্রসারলাভ করেছে। অবশ্য, অহিংসার উপর যে ধরনের বিধী-নিষেধ আরোপ করা হয়েছে তাতে একমাত্র কৃষকের পক্ষে এই ধর্ম গ্রহণ করা অসম্ভব হয়ে পড়েছে। কেননা, কৃষিকার্যের সময় অনেক কীটপতঙ্গের প্রাণনাশ অনিবার্য হয়ে ওঠে। তবে, সম্পত্তির ক্ষেত্রে যে বিধিনিষেধ আছে তা কেবল ভূসম্পত্তি সম্পর্কে প্রযোজ্য। তথাপি জৈনরা ব্যবসা ও শিল্পজাত দ্রব্যাদি বিনিময়ের ক্ষেত্রেই বিশেষ দক্ষতা অর্জন করেছে। এক্ষেত্রে সামুদ্রিক বাণিজ্য ও অভ্যন্তরীণ বাণিজ্য উভয়ই নতুন প্রাণের সঞ্চার লাভ করেছে। আর এসমস্ত কিছুই নগর সংস্কৃতির সঙ্গে ওতোপ্রোতভাবে সংযুক্ত থেকেছে। তৎকালীন প্রেক্ষিতে বিশেষ বর্ণবৈষম্য যুগে সর্বস্তরের মানুষের মর্যাদার দিকটিও প্রায় সমানভাবেই আবৃত হয়েছে। তুলনামূলক বিচারে দেখা যায় বৌদ্ধধর্মে যুগে যুগে অনেক পরিবর্তন এসেছিল। সেই তুলনায় জৈনধর্মে পরিবর্তনের পরিমাণ ছিল অনেক কম। বৌদ্ধধর্ম তার জন্মস্থান ভারতে প্রায় নিশ্চিহ্ন হয়ে গেলেও জৈন ধর্মে তা হয়নি। এদেশে জৈনদের সংখ্যা এখনও প্রায় আড়াই কোটি।

২.১.২. বৌদ্ধধর্ম :

সূচনা:

প্রতিবাদী ধর্মের উদ্ভবে বেশ কিছুটা আলোচনা আছে। কিন্তু এখানে যে কয়েকটা কথা না বললেও নয়; সেগুলিই আলোচিত হয়েছে। মনে রাখতে হবে খ্রিষ্টপূর্ব ষষ্ঠ শতাব্দী ধর্মীয় দিক থেকে সমগ্র প্রাচ্যের ইতিহাসে বিশেষ তাৎপর্যপূর্ণ। এই শতাব্দীতেই চীনে কনফুসিয়াস, পারস্যে জরথুষ্ট্র, ভারতে মহাবীর এবং গৌতমবুদ্ধ জন্মগ্রহণ করেছিলেন। এক্ষেত্রে, একমাত্র গৌতমবুদ্ধের প্রবর্তিত ধর্ম বৃহত্তর বিশ্বে দীর্ঘকাল ব্যাপক ও গভীর প্রভাব বিস্তার করেছিল। তাই এ. এল.বাসাম বুদ্ধকে ভারতে এতাবৎ কালের শ্রেষ্ঠ সন্তান বলে অভিহিত করেছেন। ডি. ডি.কোশাম্বী, বুদ্ধকে বিদেশীদের কাছে ভারতের শ্রেষ্ঠ দান বলে উল্লেখ করেছেন। তিনি বলেছন, চীন, জাপান, কোরিয়া এবং থাইল্যান্ডের শিল্প ও স্থাপত্য, বৌদ্ধ উপাদানের অভাবে দরিদ্রতর হত। প্রাচীন মঙ্গোলীয় এবং তিব্বতী সাহিত্যের প্রধান অংশ জুড়ে আছে বৌদ্ধ ধর্মশাস্ত্র। আজও এই সমস্ত দেশের মানুষেরা বৌদ্ধধর্মকে তারা যেমন বোঝে, তেমনভাবেই অনুসরণ করে। আর ভারতবর্ষের পরিপ্রেক্ষিতটি ইতিপূর্বেই আলোচিত। এছাড়া, ড. ব্রতীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় তাঁর The Genesis of Buddhism-its social content বইয়ে বৌদ্ধ ধর্মের সামাজিক অর্থনৈতিক পটভূমি বিশ্লেষণ করেছেন। তিনি তাঁর আলোচনায় দেখিয়েছেন সমাজের সর্বস্তরে আর্থ-সামাজিক বৈষম্যের ফলে যে ব্যর্থতাবোধ এসেছিল বৌদ্ধধর্মই একটি গ্রহণযোগ্য জীবনযাপন পদ্ধতির নির্দেশ দিয়ে সকল শ্রেণীর মানুষকে সেই ব্যর্থতাবোধের হাত থেকে উদ্ধার করেছিল।

টিপ্পনী

বুদ্ধ ও তাঁর ধর্মমত:

গৌতম বুদ্ধ সম্পর্কে খুব একটা বেশী কিছু জানা যায় না। কারণ সমসাময়িক নির্ভরযোগ্য ঐতিহাসিক উপাদানের একান্ত অপ্রতুল্যতা। জাতক, সিংহলী ইতিবৃত্ত সহ যুক্ত নিপাত-এর দুটি কবিতা ও পরবর্তীকালে সংস্কৃত ভাষায় লিখিত গ্রন্থ ললিতবিস্তর তাঁর সম্পর্কে অংশত জানতে সাহায্য করে। বাসাম বলেছেন তাঁর জীবন নয়, তাঁর ভক্তরা এই জীবন সম্পর্কে কি বিশ্বাস করত সে সম্পর্কেও আলোচনা করা যায়। অনুরূপভাবে বলা যেতে পারে তিনি কি শিখিয়েছিলেন তা নয়, বৌদ্ধধর্ম কি শিখিয়েছিল, সে সম্পর্কেও আলোচনা করা যেতে পারে।

মহাবীর ও গৌতমবুদ্ধ:

মহাবীর ও গৌতমবুদ্ধ, দু'জনেই ছিলেন সমসাময়িক। কিন্তু নতুন ধর্মের প্রচারক হিসাবে বুদ্ধদেবের খ্যাতি ছিল বেশী। সারা এশিয়ায় বৌদ্ধধর্মই প্রধান ধর্ম হয়ে দাঁড়ালো। বুদ্ধ ('আক্ষরিক অর্থে জ্ঞানপ্রাপ্ত) এসেছিলেন শাক্য উপজাতীয় গণরাজ্য থেকে। তাঁর বাবা ছিলেন ওই উপজাতির ক্ষত্রিয় প্রধান। কিন্তু বুদ্ধের জীবনকাহিনীর সঙ্গে যীশুখ্রীষ্টের জীবনকাহিনীর অনেক মিল ধরা পড়ে। যেমন, তাঁদের মায়েদের অলৌকিক উপায়ে গর্ভধারণ, শয়তানের প্রলোভন ইত্যাদি। বুদ্ধের পূর্ব নাম ছিল সিদ্ধার্থ। গৌতম গোত্রজাত বলে তাঁর অপর নাম গৌতম। সত্য বা মিথ্যা যাই হোক না কেন তাঁর জন্ম সম্পর্কে একটি সুন্দর কাহিনী প্রচলিত আছে। কাহিনীতে জানা যায় একদিন রাত্রে মায়াদেবী স্বপ্ন দেখছেন সে নাকি হিমালয়ের একটি হ্রদে গেছেন এবং সেখানে একটি শ্বেতহস্তী শুড়ের উপর একটি পদ্মফুল নিয়ে তার কাছে এসেছে। পরের দিন গণৎকারেরা এই স্বপ্নের ব্যাখ্যা করে বললেন মায়ার গর্ভজাত সন্তান হয় একজন মহৎ সম্রাট, না হয় একজন মহৎ ধর্মপ্রচারক হবে। তবে সে ব্যাখ্যা যাইহোক না কেন তিনি যে আজ কি সে সম্পর্কে আর ব্যাখ্যা করার প্রয়োজন হবে না। বুদ্ধের জন্ম হয়েছিল খ্রিষ্টপূর্ব ৫৬৬ সালে। রাজপ্রাসাদের জীবন তার কাছে ক্রমস অসহ্য হয়ে উঠেছিল। আসলে তার সম্পর্কে যে ভবিষ্যৎবাণী করা হয়েছিল

সে সম্পর্কে পিতা শুদ্ধোদন দুশ্চিন্তায় ছিলেন। তাই রাজপ্রাসাদে পুত্র বুদ্ধের গন্ডীজীবন আরো নিশ্চিদ্র ও সংকুচিত করা হয়। কিন্তু সবকিছুই হার মানল ২৯ বছর বয়সে যেদিন পুত্র রাহুল জন্মগ্রহণ করলেন। সেদিনই তিনি সন্ন্যাসীর বেশে গৃহত্যাগ করলেন। এরপর তিনি পরিধেয় বস্ত্র সম্বল করেই পরিব্রাজক হয়ে জীবন শুরু করলেন। বৌদ্ধধর্মে এই গৃহত্যাগের ঘটনাটিকে 'মহাবিনিভ্রমণ' নামে অবিহিত করা হয়। ছয় বছর কঠোর কৃচ্ছসাধনের পর বুদ্ধের মনে হয়েছিল সন্ন্যাসের মধ্যে মুক্তি নেই। তাই তিনি এই মুক্তির উপায় অনুসন্ধানে বেঁছে নিয়েছিলেন ধ্যান। ৪৯(উনপঞ্চাশ) দিন পরে তাঁর দিব্য জ্ঞানলাভ ঘটল এবং তিনি দু:খকষ্টের কারণ উপলব্ধি করতে পারলেন। বুদ্ধ তাঁর এই জ্ঞান প্রচার করবেন কিনা, এ সম্পর্কে তাঁর মনে দ্বিধা ছিল। এরপর স্বয়ং ব্রহ্মার অনুরোধে তিনি এই কাজে ব্রতী হন। তখন তিনি বারাণসীর নিকটবর্তী সারনাথে আসেন। সেখানে যে পাঁচজন শিষ্য ইতিপূর্বে তাঁকে ত্যাগ করেছিল, তাদের মধ্যে তাঁর ধর্মমত সর্বপ্রথম প্রচার করলেন। ইতিহাসে এই ঘটনা 'ধর্মচক্র প্রবর্তন' নামে পরিচিত। আর একে ভিত্তি করেই রচিত হয়েছে বৌদ্ধধর্মের অন্যান্য উপদেশ। এর মধ্যে ছিল চারটি মহৎ সত্য (যথা–সৎ ধারণা, সৎ সিদ্ধান্ত, সৎ বাক্য, সৎ আচরণ, সৎ বৃত্তি, সৎ চেষ্টা, সৎ স্মৃতি ও ধ্যান। এগুলির সবগুলিকে মিলিয়ে বলা হতো মধ্যপন্থা)। এখানে কোনো জটিল তাত্ত্বিক ধারণা নেই যা কিনা সাধারণের বুঝতে বা করতে অসুবিধা হবে। বা তা বোঝাবার জন্যে জটিল দর্শনচিন্তারও প্রয়োজন ছিল না। এক্ষেত্রে পরম মুক্তির পথ হল পুনর্জন্ম চঙ্গের বাইরে বেরিয়ে এসে নির্বাণলাভ। তথাপি বৌদ্ধমতে মুক্তির পথে পৌঁছতে গেলে তার মধ্যে কর্মফলের একটা ভূমিকা এসে পড়ে। বুদ্ধ জাতিভেদ মানতেন না বলে বৌদ্ধধর্মে ব্রাহ্মণদের ধারণা মতো কর্মফল অনুযায়ী জাতিভেদের কথা মানা হতো না। আর এর মধ্যে ঈশ্বরেরও কোনো প্রতক্ষ ভূমিকা নেই। শাস্ত্রবহির্ভূত অথচ জনপ্রিয় দুটি প্রথা–বৃক্ষপূজা ও সমাধিস্তূপ বৌদ্ধরা গ্রহণ করার ফলে সাধারণ মানুষের পূজাপদ্ধতির সঙ্গে বৌদ্ধধর্মের সংযোগ স্থাপিত হয়েছিল। উপদেশবলী ছড়িয়ে দেওয়ার মাধ্যম কী হবে সে বিষয়টি ছিল অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। এক্ষেত্রে সংঘের কথাই উঠে এসেছিল। কেননা একদিন বৌদ্ধ ভিক্ষু–ভিক্ষুনীরা পরিব্রাজকের ন্যায় উপদেশবলী ছড়িয়ে যাচ্ছিলেন। যার না ছিল কোন সুপ্রতিষ্ঠিত কেন্দ্র বিন্দু–যেখান থেকে কিনা খুব কম সময়েই অনেক বেশি এ কাজ করা সম্ভব ছিল। একই সঙ্গে সংঘবদ্ধের মধ্যে থেকে যে কাজ করা সম্ভব তা একার পক্ষে অনেক সময় দুরূহ হয়ে পড়ে। দেখা গেল বহু মঠ প্রতিষ্ঠার সঙ্গে সঙ্গে সে কাজের গতি বহুগুণ বৃদ্ধি পেল। একই সঙ্গে এই পর্বে বৌদ্ধভিক্ষুনীদের জন্য পৃথক মঠ স্থাপনও করা হয়েছিল–যা কিনা স্ত্রী স্বাধীনতার একটা বৈপ্লবিক পদক্ষেপ বলা যেতে পারে। সমাজের বিভিন্ন স্তরে ও অনুষ্ঠানে মেয়েদের অংশগ্রহণের যতটুকু অধিকার ব্রাহ্মণেরা দিয়েছিলেন পরবর্তীযুগে ভারতবর্ষের সমস্ত ধর্মসংস্কারক ও সমাজসংস্কারকরা তাকে অত্যন্ত সীমিত বলে মনে করতেন এবং ওই স্বাধীনতার প্রসারে উৎসাহ দিয়েছিলেন। যেমন, তামিল ভক্তিবাদ আন্দোলন এবং উনিশ শতকে ব্রাহ্মসমাজ ও আর্যসমাজ, রোমিলা থাপার, ভারতবর্ষের ইতিহাস, পৃ: ৪৬। এইসব মঠগুলিতে গণতান্ত্রিক পদ্ধতিই অনুসৃত হতো ঠিক যেমনটি গণরাজ্যগুলিতে ছিল। আর ধীরে ধীরে এগুলি বিদ্যাচর্চার বৃহৎ কেন্দ্রে পরিণত হয়েছিল, বিক্রমশিলা, সোমপুরি ও দন্তপুরি এবং নালন্দা তারই প্রকৃষ্ট দৃষ্টান্ত।

টিপ্পনী

<u>রাষ্ট্রীয় পৃষ্ঠপোষকতালাভ</u> :

বুদ্ধ তাঁর ধর্ম প্রথম সারনাথের মধ্যে দিয়ে বারাণসী, রাজগৃহ ও কপিলাবস্তুতে প্রচার করেছিলেন। এছাড়া, এয়া, উরুবিল্ব, নালন্দ ও পাটলিপুত্রতেও তাঁর ধর্ম বিস্তারলাভ করে। মগধে বৌদ্ধধর্মের ভিত্তি স্থাপিত হলেও, এর প্রকৃত উন্নতি হয়েছিল কোশল রাজ্যে। একথা বললে অত্যুক্তি হয় না বুদ্ধের মৃত্যুর সময় তাঁর ধর্ম একটি সঙ্কীর্ণ ভৌগলিক সীমায় আবদ্ধ ছিল। পরবর্তীকালে অশোক একে প্রায় বিশ্বধর্মে পরিণত করেন। অশোক তাঁর রাজত্বের অষ্টম বৎসরে বৌদ্ধধর্ম গ্রহণ করেছিলেন। ইতিপূর্বে তিনি ছিলেন একজন উপাসক মাত্র। প্রথম

অপ্রধান শিলালেখতে তিনি বলেছেন তাঁর রাজত্বের দশম বৎসরের মধ্যভাগে যখন তিনি ভিক্ষুগতিক হন, তখন আকস্মাৎ তাঁর জীবনে পরিবর্তন আসে। অষ্টম শিলালেখতে অশোক বলেছেন যে, তাঁর রাজত্বের দশম বৎসরে তিনি বিহার যাত্রার ফলশ্রুতি। ত্রয়োদশ শিলালেখতে অশোক দাবি করেছেন যে, তিনি তাঁর ধর্মবিজয়ের নীতি ভারতের বাইরে, সীমান্তবর্তী রাজ্যসমূহে এবং যোজন দূর পর্যন্ত কার্যকর করেছিলেন। এজন্য তিনি বিভিন্ন রাজ্যে ভিন্ন ভিন্ন ধর্মদূতও পাঠিয়েছিলেন। তবে, আফ্রিকা বা গ্রীসে তিনি যে বৌদ্ধধর্মের প্রসার ঘটিয়েছিলেন, তার কোন নিশ্চিত প্রমাণ পাওয়া যায়নি।

টিপ্পনী

<u>বৌদ্ধধর্মের প্রভাব</u>:

তৎকালীন সমাজে কৃষি ও বাণিজ্যের প্রসারে বৌদ্ধধর্মের প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ অবদান রয়েছে। আবার বর্ণবৈষম্য ও দারিদ্র এই দুইয়ের মেল বন্ধনের বৌদ্ধধর্মের প্রত্যক্ষ ভূমিকা রয়েছে। দীর্ঘ নিকয়-এ স্পষ্ট বলা হয়েছে যে, যদি কোন ব্যক্তি সম্পদ সৃষ্টি করতে না পারে, তাহলে সে দরিদ্র হয়। এবং এই দারিদ্রই দুর্নীতি এবং অন্য সব অপরাধের উৎস। সুতরাং অপরাধ দূর করতে হলে উৎপাদনের সংস্থান কৃষক, শ্রমিক ও বণিকদের হাতে দিতে হবে। তথাপি তৎকালীন পরিস্থিতির মোকাবিলায় বৌদ্ধধর্ম যে উপযোগী পন্থা অবলম্বন করেছিল তা অস্বীকার করার কোন উপায় নেই। এছাড়া, মহান সম্রাট অশোকের আলোক উজ্জ্বল শাসন ব্যবস্থাতেও বৌদ্ধধর্মের অবদান কম ছিল না। চীন, জাপান, কোরিয়া এবং থাইল্যান্ডের শিল্প ও স্থাপত্যে নিদর্শন বৌদ্ধধর্মেরই অবদান। প্রাচীন মঙ্গোলীয় এবং তিব্বতী সাহিত্যের প্রধান অংশ জুড়ে আছে বৌদ্ধধর্মশাস্ত্র। কিন্তু উৎসস্থল ভারতে আজ এই ধর্মের অস্তিত্ব প্রায় মুছে যেতে চলেছে। তবে, ভারতীয় সংস্কৃতিতে বিহারগুলির অবদান আজ কম বেশি পরিলক্ষিত হয়েছে।

২.১.৩. <u>উভয়ধর্মের সাদৃশ্য</u>:

দুটি ধর্মের প্রচারকরা এসেছিলেন ক্ষত্রিয়গোষ্ঠী থেকে। তাঁরা ব্রাহ্মণদের গোঁড়ামির বিরোধী ছিলেন, বেদের কর্তৃত্ব অস্বীকার করেন, এবং পশুবলি প্রথার বিরোধী ছিলেন। উভয় ধর্মই সমাজের নিম্নশ্রেণীর মানুষদের আকর্ষণ করে। বৈশ্যরা ধনী হওয়া সত্ত্বেও সমাজে তেমন সম্মান পেতেন না, আর শূদ্ররা তো অত্যাচারিত শ্রেণী ছিলেনই। জাতিভেদকে সরাসরি আক্রমণ না করলেও বৌদ্ধধর্ম ও জৈনধর্ম বর্ণাশ্রমের বিরোধী ছিল এবং এগুলিকে বর্ণভেদহীন আন্দোলন বলা চলে। বৌদ্ধধর্ম ও জৈনধর্ম প্রচলিত সংস্কারবিরোধী এই দুই ধর্ম প্রসারলাভ করেছিল মূলত শহরাঞ্চলের নিম্নশ্রেণীর মানুষকে কেন্দ্র করেই। পরবর্তী শতাব্দীগুলিতে এই বৈশিষ্ট্য লক্ষ্য করা যায় ভক্তি আন্দোলনের বিভিন্ন স্তরে।

প্রশ্নাবলী

১. প্রতিবাদী ধর্মের উদ্ভব সম্পর্কে আলোচনা কর।

২. জৈন ধর্ম তৎকালীন সমাজজীবনকে কতটা প্রভাবিত করেছিল?

৩. বুদ্ধদেবের ধর্মমত সম্পর্কে কী জানেন? বৌদ্ধধর্মের প্রভাব সম্পর্কে আলোচনা করুন।

সংক্ষিপ্ত :

১. 'জৈন' শব্দটি কোথা থেকে এসেছে?

২. বর্ধমান নামে কে পরিচিত?

৩. রাজচক্রবর্তীর সংখ্যা কত?

৪. কোন ধর্মে জীব ও অজীবকে গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে?

৫. The Genesis of Buddhism-its social content গ্রন্থটি কার লেখা?

৬. মায়াদেবী কে ছিলেন?

৭. মধ্যপন্থা কী?

৮. সারনাথ কোথায় অবস্থিত?

৯. 'ধর্মচক্র প্রবর্তন' কী?

১০. 'অষ্টাঙ্গিক মার্গ' কী?

১১. 'মহাবিনিভ্রমণ' কার নামের সঙ্গে যুক্ত?

১২. ভারতের বাইরে বৌদ্ধধর্মের আধিক্য লক্ষ্য করা যায় এমন দুটি দেশের নাম লিখুন।

গ্রন্থপঞ্জী:

১. A.L.Bashan, 'The Wonder that was India'গ্রন্থের বাংলা অনুবাদ (এই গ্রন্থ থেকে বেশিরভাগ সংগৃহীত)

২. রোমিলা থাপার, ভারতবর্ষের ইতিহাস (এই গ্রন্থ থেকে অনেকাংশে সংগৃহীত)

৩. D.N.Jha, Ancient India in Historical outline

৪. তসলিম চৌধুরী ভারতের ইতিহাস

- 'প্রথম তীর্থঙ্কর – ঋষভদেব।
- ত্রয়োবিংশ তীর্থঙ্কর – পার্শ্বনাথ।
- সর্বশেষ তীর্থঙ্কর – মহাবীর।
- 'চতুর্যাম' – অহিংসা, সত্য, অচৌর্য ও অপরিগ্রহ।
- 'পঞ্চ মহাব্রত' – চতুর্যাম বা চারটি নীতির সঙ্গে মহাবীর ব্রহ্মচর্য যুক্ত করেন। এই পাঁচটি নীতি 'পঞ্চ মহাব্রত' নামে পরিচিত।
- 'ত্রিরত্ন' – সত্য বিশ্বাস, সত্য জ্ঞান এবং সত্য আচরণ।
- দিগম্বর – ভদ্রবাহুর নেতৃত্বাধীন দাক্ষিণাত্যের জৈনরা।
- শ্বেতাম্বর – স্থূলভদ্রের নেতৃত্বাধীন উত্তর ভারতের জৈনরা।
- জৈন ধর্মমতের সমর্থক – বিম্বিসার, অজাতশত্রু ও চন্দ্রগুপ্ত মৌর্য।
- চন্দ্রগুপ্ত মুনি – চন্দ্রগুপ্ত মৌর্য।
- জৈন ধর্মের পৃষ্ঠপোষক – খারবেল, মন্ডলিক, জয়সিংহ ও কুমারপাল প্রভৃতি।
- 'কল্পসূত্র' – ভদ্রবাহু রচিত জৈনদের আদি শাস্ত্রগ্রন্থ।

টিপ্পনী

- ‘দ্বাদশ অঙ্গ’ – প্রথম জৈন সংগীতিতে জৈন ধর্মশাস্ত্রকে চৌদ্দটি পর্বের পরিবর্তে বারোটি অঙ্গতে সংকলিত করা হয়। এগুলিকে ‘দ্বাদশ অঙ্গ’ বলা হয়।
- জৈন দার্শনিক – ভদ্রবাহু, স্থূলভদ্র, হেমচন্দ্র, সিদ্ধসেন, হরিভদ্র প্রমুখগণ।
- পার্শ্বনাথ – পিতা অশ্বসেন, মাতা বামাদেবী, পত্নী প্রভাবতী দেবী।
- মহাবীর – পিতৃদত্ত নাম বর্ধমান, পিতা সিদ্ধার্থ, মাতা ত্রিশলা, পত্নী যশোদা, কন্যা অনোজ্জা বা প্রিয়দর্শনা।
- জিন – জয়ী।
- দাক্ষিণাত্যের জৈনধর্ম – শ্রাবণবেলগোলা।
- জৈনধর্ম প্রচারিত স্থান – কলিঙ্গ, মগধ, মালব, গুজরাট, রাজস্থান প্রভৃতি।
- ‘জৈন সিদ্ধান্ত’ – দ্বিতীয় জৈন সংগীতি-তে পুঃনরায় জৈন ধর্ম গ্রন্থ সংকলন করা হয়। বর্তমানে ওই সংকলন ‘জৈন আগমন’ বা ‘জৈন সিদ্ধান্ত’ নামে পরিচিত।
- জৈন ধর্ম – উপনিষদ ও আরণ্যকের চিন্তাধারা থেকে উদ্ভূত। জৈনরা জন্মান্তরবাদ ও কর্মফলে বিশ্বাসী।
- গৌতম বুদ্ধ – পিতা শুদ্ধোদন, মাতা মায়াদেবী, বিমাতা মহাপ্রজাপতি গৌতমী, পত্নী যশোধরা, পুত্র রাহুল।
- মহাভিনিস্ক্রমণ – বৌদ্ধশাস্ত্রে গৌতমের গৃহত্যাগের ঘটনা ‘মহাভিনিস্ক্রমণ’ নামে খ্যাত।
- ‘বুদ্ধগয়া’ ও ‘বেধিবৃক্ষ’ – যে স্থানে (গয়ার নিকটবর্তী উরুবিল্ব) গৌতম বুদ্ধত্ব লাভ করেন তার নাম ‘বোধগয়া’ বা ‘বুদ্ধগয়া’ এবং সে বৃক্ষটির (অশ্বত্থ) নীচে ধ্যানরত হয়ে তিনি বুদ্ধত্ব অর্জন করেন তার নাম বোধিবৃক্ষ।
- পঞ্চভিক্ষু – বণ্য, উদ্রিয়, অশ্বজিৎ, মহানাম ও কৌন্ডিন্য।
- ধর্মচক্র প্রবর্তন – বুদ্ধত্ব লাভের পর কাশীর নিকটবর্তী বর্তমান সারনাথের মৃগদাবে ‘পঞ্চভিক্ষু’ নামে পরিচিত বুদ্ধ তাঁর প্রথম পাঁচজন শিষ্যের কাছে মৃগদারে ‘পঞ্চভিক্ষু’ নামে পরিচিত বুদ্ধ তাঁর প্রথম পাঁচজন শিষ্যের কাছে তাঁর ধর্মমত প্রচার করেন। এই ঘটনা ধর্মচক্র প্রবর্তন নামে খ্যাত।
- বুদ্ধদেবের শিষ্য – সারিপুও, অনাথ পিন্ডক, উপালি, আম্রপালি, বিম্বিগার, অজাতশত্রু, প্রসেনজৎ প্রমুখগণ।
- মহাপরিনির্বাণ – বৌদ্ধশাস্ত্রে বুদ্ধের দেহাবসান ‘মহাপরিনির্বাণ’ নামে খ্যাত।
- ‘আর্যসত্য’ – ১) জগৎ দুঃখময়, ২) কামনা, বাসনা, তৃষ্ণা ও আসক্তিই হল দুঃখের কারণ, ৩) দুঃখের কারণগুলি ধ্বংস করে দুঃখের হাত থেকে নিষ্কৃতি পাওয়া যায়, ৪) এই কারণগুলি ধ্বংসের উপায় আছে। এরজন্য ‘অষ্টাঙ্গিক মার্গ’ অনুশীলন করতে হবে।
- অষ্টমার্গ – সৎ বাক্য, সৎ কার্য, সৎ জীবন, সৎ চেষ্টা, সৎ চিন্তা, সৎ সংকল্প, সৎ দৃষ্টি ও সৎ সমাধি।
- মধ্য পন্থা – বুদ্ধদেব চরম ভোগবিলাস এবং চরম কৃচ্ছসাধনা ও তপশ্চর্যা এই দুই

চরমপন্থার মধ্যবর্তী মধ্যপন্থা বা মধ্যপথ অবলম্বনের পক্ষপাতী ছিলেন।

- ‘ত্রিপিটক’ – সূত্র পিটক, বিনয় পিটক, অভিধর্ম পিটক। পিটক কথার অর্থ পাত্র বা ঝুড়ি।
- ‘মহাযান ও হীনযান’ – বৌদ্ধদের দুটি সম্প্রদায় (চতুর্থ বৌদ্ধ সংগীতিতে বৌদ্ধরা এই দুই সম্প্রদায়ে বিভক্ত হয়ে যায়।

টিপ্পনী

টিপ্পনী

পর্যায় ২.২. সুফিবাদ ও ভক্তি আন্দোলন

টিপ্পনী

একক ২.২.১. সুফি আন্দোলন

- পটভূমি
- সুফি, সুফিবাদ ও তার তত্ত্ব
- সুফি আন্দোলনের সূচনা ও বিস্তার
- শাসক ও সন্ত সুফি
- ইসলামের মধ্যে সুফি
- সুফিদের অবদান বা সুফিবাদের প্রভাব

একক ২.২.২. ভক্তি আন্দোলন

- পটভূমি
- ভক্তি আন্দোলনের ধারা
- বাংলাতে ভক্তি আন্দোলন
- রামানন্দ ও কবীর
- গুরু নানক
- তুলসীদাস
- দাদু-দয়াল, সুরদাস ও মীরাবাঈ
- ভক্তিবাদের প্রভাব
- সুফি ও ভক্তিবাদে উদারনৈতিক সমন্বয়
- উপসংহার

২.২.১. <u>সুফি আন্দোলন</u>:

<u>পটভূমি</u>:

ধর্মের কথা বললেই তা যেন আমাদের একটি নির্দিষ্ট গন্ডীর মধ্যে আবদ্ধ রেখে সেই দৃষ্টিকোণ থেকেই পরিচালিত করে চলে। বিষয়টি এত সহজে সর্বাঙ্গীন বা বিশ্বজনীন হয়ে ওঠেনি; কিন্তু প্রত্যেক ধর্মেরই একটি সারসত্ত্বা থাকে সেটির মধ্য দিয়ে কিছু বার্তা পৌঁছে দেওয়া হয়। প্রাচীন ভারতবর্ষে জৈন বা বৌদ্ধ বা বৈষ্ণব কিংবা মধ্যযুগে হিন্দুধর্ম বা ইসলাম এর ব্যতিক্রম নয়। ধর্মের মধ্য দিয়েও সমাজ-সংস্কার বা মানুষে-মানুষে ভেদাভেদ দূর করতে সম্ভব হয়। হিন্দুধর্মে যখন উদার ভক্তিবাদী সংস্কার আন্দোলন চলেছিল, তখন ইসলাম ধর্মের ক্ষেত্রেও উদার সংস্কার আন্দোলন বহু পূর্ব থেকেই শুরু হয়ে গিয়েছিল। তবে যীশু তাঁর অনুগামীদের যেভাবে অধিকারের ন্যায্যতার বিষয়ে পরিষ্কার বার্তা দিয়ে গিয়েছিলেন; মহম্মদ ঠিক সেরূপ করেননি। আর সেজন্যই ইসলামের ইতিহাসে যত ধর্মীয় বা আধ্যাত্মিক আন্দোলন দেখা দিয়েছে তার অন্তিম দ্বারপ্রান্তে বা পরোক্ষ ফলাফলের সঙ্গে রাজনীতির যোগসাধন পরিলক্ষিত হয়েছে।

তুর্কিদের উত্থান আর তাদের হাতেই আব্বাসীয় বংশের খলিফাদের পতন; শুধু একটি শাসন ক্ষমতার পরিবর্তন ছিল না। পরিবর্তন ঘটেছিল মানুষের ধ্যানধারণা ও বিশ্বাসেও। আর এই তুর্কিরাই বাগদাদের ঐতিহ্য গজনী হয়ে ভারতে বহন করে আনে। আনুমাণিক খ্রিষ্টীয় দশম শতাব্দী থেকে ইসলাম ধর্মকে কেন্দ্র করে ঐতিহ্যবাদীরা চারটি সম্প্রদায়ে বিভক্ত হয়ে পড়ে। এদের মধ্যে সবচেয়ে উদার ছিল 'হানাফি' সম্প্রদায়। আর তুর্কিরাই ছিল এই উদার হানাফি সম্প্রদায়ভুক্ত এবং তারাই ভারতে সুলতানি যুগের সূচনা করে। ইসলামের প্রথম পর্বেই রহস্যভেদী সম্প্রদায়ের উদ্ভব হয়। এই রহস্যবাদীরা ইসলাম ধর্মে যে উদারনৈতিক সংস্কার আন্দোলনের সূচনা করেন, সেটাই 'সুফি আন্দোলন' নামে খ্যাত।

টিপ্পনী

সুফি, সুফিবাদ ও তার তত্ত্ব:

'সুফি' শব্দটি আরবি 'সফা'(পবিত্রতা) থেকে উদ্ভূত। তবে, এই শব্দটির আর একটি অর্থ হল 'অকপটতা'। এদিক থেকে বাহ্যিক আচার অনুষ্ঠান অপেক্ষা আন্তরিক পবিত্রতা ও অকপটতার সাধনা যাঁরা করেন, তাঁরাই সুফি। সুফিবাদ কী তা দু'এক কথায় সঠিক ব্যাখ্যা হয় না। এই মতবাদ কোরান ও হজরত মহম্মদের জীবনাদর্শের উপর ভিত্তি করে গড়ে উঠলেও, এদের গ্রীক ও বৌদ্ধধর্মের প্রভাব লক্ষ্য করা যায়। আবার অনেকের মতে সুফিবাদে নাথপন্থীদের প্রভাব পড়েছিল। নাথপন্থীরা প্রকৃত পক্ষে ঈশ্বরবাদী ছিলেন না। এঁরা ছিলেন মূলত নিরীশ্বরবাদী ও রহস্যবাদী। ড. এ. এল. শ্রীবাস্তবের মতে, ভারতবর্ষে সুফি মতবাদ নাথপন্থীদের ধ্যানধারণার দ্বারা প্রভাবিত হয়েছিল। এস.এ.এ. রিজভীর লেখা থেকে জানা যায় যে নাথপন্থীযোগীরা সুফি বাদে বিশেষভাবে প্রভাবিত হন। কোরানে স্পষ্ট সমর্থিত এই যে হজরত মহম্মদ নিজে ছি লেন অতীন্দ্রিয়বাদী। এই অতীন্দ্রিয়বাদে ভারতীয় প্রভাব সুস্পষ্ট লক্ষ্য করা যায়। এদিক থেকে প্রকৃতগত অর্থে মুসলিম অতীন্দ্রিয়বাদই হল সুফিবাদ। এই মতবাদের মূল কথা হল যুক্তিতর্কের সাহায্য না নিয়ে অনুভব ও উপলব্ধির মাধ্যমে এবং নিজের মধ্যে আধ্যাত্মিক শক্তি জাগ্রত করে ঈশ্বরই যে ঐক্যসূত্র এতে হৃদয়ঙ্গম করা। তবে সুফি মতবাদে প্রশান্ত মন এবং অপ্রমত্ত চিত্ত অধিকতর অপরিহার্য ও গৃহিত। তাই এখানে গাঁয়েগঞ্জে নিম্নবর্ণের ও নিম্নবর্গের মানুষ অভাবমুক্তির আশায় আসতে শুরু করে এবং ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করে।

সুফি আন্দোলনের সূচনা ও বিস্তার

প্রথম দিককার সুফিরা নির্জনে আশ্রম বা 'খনকাহ্' তৈরী করে দীন-দরিদ্রের যথার্থ প্রতিবেশি হয়ে উঠে ছিলেন। এই সময়কার খানবাহ্গুলি জনসাধারণের দানে পরিচালিত হলেও, কালক্রমে তাঁদের জনপ্রিয়তা রাজকীয় দৃষ্টি আকর্ষণ করেছিল। ত্রয়োদশ শতাব্দী নাগাদ দেখা যায় যে চৌদ্দটি সিলসিলা বিশেষ গুরুত্ব লাভ করে। খানবাহ্গুলিতে গরীব দু:খীদের বিনা পয়সায় খাওয়া-দাওয়া ও আশ্রয়ের ব্যবস্থা করা হত। ভারতে সিলসিলা বা শ্রেণীগুলির মধ্যে চিস্তিয়া ও সুরাবর্দিরা সর্বাধিক জনপ্রিয়তা অর্জন করেছিল। প্রথমটি সিন্ধু, পাঞ্জাব ও মুলতানে প্রাধান্য বিস্তার করেছিল এবং চিস্তিয়া শ্রেণী আজমীর বা রাজস্থানে কিংবা দিল্লীতে প্রাধান্য বিস্তার করেছিল। বাংলা, বিহার, উড়িষ্যা ও দাক্ষিণাত্যেও এই শ্রেণীর প্রভাব বেশ খানিকটা লক্ষ্য করা যায়। চিস্তিয়া সুফি সম্প্রদায়ের কাছে সকল ধর্মের মানুষ সমান ছিল। তাঁদের মধ্যে ধর্মীয় ভেদাভেদ ছিল না।

শাসক ও সন্ত সুফি:

ভারতবর্ষের শাসকের সঙ্গে সুফিবাদীরা যে সর্বদা সহমত পোষণ করতেন তা কিন্তু নয়। বেশিরভাগই সুলতানি রাজনীতির ক্রমবিকাশের ধারাকে তাঁরা মেনে নিতে পারেননি।

এজন্য সম্পর্কেরও তোয়াক্কা তাঁরা করতেন না। প্রয়োজনে, সুলতানদের কাছ থেকে তারা বহু দূরে চলে যেতেন। তবুও সুলতানের ঐশ্বর্যের আস্ফালন, অমিতব্যয়িতা ও নৈতিক অবনতির সঙ্গে কখনই আপসরফা করতেন না। আবার অনেক সুলতানের চোখে সুফি সন্তরা ছিলেন শ্রদ্ধার পাত্র। ১২২৮ খ্রিষ্টাব্দে ইলতুৎমিশ তাঁর অধিকারে নিয়ে এলেন মুলতানকে এবং বহাউদ্দীনকে নিযুক্ত করলেন সেখানকার শেখ-উল-ইসলাম (মুসলিম সম্প্রদায়ের নেতা)। কোনো প্রশাসনিক দায়িত্ব যে তাঁকে পালন করতে হত তা নয়, তবে জনসাধারণের চোখে এতে তাঁর মর্যাদা বেড়ে গেল। মুলতানের উপরে মোঙ্গলদের বারংবার আক্রমণের সময়ে জনসাধারণের মধ্যে বহাউদ্দীন যে সাহস ও উৎসাহ প্রদান করেছিলেন তার মধ্য দিয়ে দেশাত্মবোধক স্বচেতনতা গড়ে ওঠে। এমনকী তিনি আক্রমণকারী ও মুসলিম সেনাদলের মধ্যে শান্তি প্রতিষ্ঠাতেও সফল হয়েছিলেন। সুফি আন্দোলনে আলাউদ্দীন খলজী থেকে মহম্মদ-বিন-তুঘলক পর্যন্ত সবাই যাকে সম্মানের চোখে দেখতেন তিনি হলেন শেখ রুক্‌নুদ্দীন। তাঁর মতে সুফি সম্প্রদায়ের নেতাদের তিনটি জিনিস থাকা দরকার। কিছু সম্পত্তি-যাতে কিনা কলন্দরদের শরবত খাবার গাবি মেটানো সম্ভব হয়। আর দ্বিতীয়টি হল জ্ঞান। এর দ্বারাই সে উলেমা সম্প্রদায়ের সঙ্গে পান্ডিত্যপূর্ণ বিষয় নিয়ে করতে সক্ষম হবেন। এবং 'হাল' (অতীন্দ্রিয়বাদী সাধনার আলোতে উদ্ভাসিত থাকা) ও থাকা প্রয়োজন। এ না থাকলে অন্যের মনে প্রভাব বিস্তার তো দূরের কথা জায়গা পর্যন্ত হয় না। সুফিরা তাদের কাজের মধ্য দিয়ে সর্বস্তরের মানুষের কাছে এমন পৌছোতে চলেছে । তাদের আন্দোলন প্রশমিত করার জন্য কম চক্রান্ত করা হয়নি। দৃষ্টান্ত স্বরূপ উলেমাদের কথা বলা যেতে পারে। মহম্মদ বিন তুঘলক ও ফিরুজ তুঘলকের রাজত্বকালের আগাগোড়াই মুজীয়ারস্থিত শেখ শরাফুদ্দীনের খান্‌কা ছিল আধ্যাত্মিক জীবনচর্চাতে অভিলাষী মানুষদের মিলনক্ষেত্র। কিন্তু সুলতান ফিরুজের কার্যকলাপ খুবই হতাশ করেছিল তাঁকে। নির্মমভাবে ফিরুজ হত্যা করেছিলেন শেখ ঈজ্ ককুয়ী, শেখ আহমদ বিহারী প্রমুখ শরাফুদ্দীনের একাধিক বন্ধু ও সমগোত্রীয় সুফিকে। কিন্তু সুফি আন্দোলন থেমে থাকেনি। আধ্যাত্মিক চিন্তার ক্ষেত্রেও তাঁরা যথেষ্ট প্রভাব বিস্তার করতে সক্ষম হয়েছিল। খ্বাজা মুইনুদ্দীনের যেসব উক্তি সুফি আন্দোলনে জোয়ার এনেছিল তা আজও মানুষের হৃদয়কে নাড়া দেয়। ''তাঁর জীবনের ব্রত ছিল মানুষের মনে ধর্মানুরাগ, বিনয়নম্রতা এবং ঈশ্বরের ভক্তি দৃঢ়মূল করে তোলা''। তাঁর অভিমত ছিল এই যে ''ঈশ্বরকে যারা চিনেছে তারা অকারণে মেশে না অপর মানুষের সঙ্গে এবং নীরব থাকে ঈশ্বর-সম্পর্কিত জ্ঞানের কথা উঠলে। তাঁর উক্তির সঙ্গে মিল পাওয়া যায় নবম শতাব্দীর সুফি আবু ইয়েজিদের উক্তিসমূহের। দৃষ্টান্ত ''আগের মতো আমরাও আমাদের খোলস পরিত্যাগ করে গভীর মনোযোগসহকারে সব লক্ষ্য করি। কোনো প্রভেদ আমরা পাইনি প্রেমিক প্রেমিকা ও প্রেমের মধ্যে। ঐশ্বরিক ঐক্যচেতনার রাজ্যে তারা সব এক।'' সুফি আন্দোলন তৎসময়ে জনপ্রিয়তা অর্জন করেছিল । একদিকে সুফিসন্তদের অনাড়ম্বর জীবন অন্যদিকে কর্মপন্থা যা কিনা সাধারণ মানুষকে আকৃষ্ট করেছিল। যে কারণেই হোক না কেন দিল্লী থেকে অযোধ্যা নামক স্থানে বাবা ফরীদ যখন চলে এলেন তখন তাঁর অনাড়ম্বর জীবন-আসবাবপত্রহীন ভূমিশয্যা বা খাদ্য ছিল তাঁর বনের ফল ও জোয়ারী রুটি। এদিকটিও মানুষের মনে রেখাপাত করেছিল। শেখ নিজামুদ্দীনের মতে প্রার্থণা বা ধ্যানের চর্চার সঙ্গে সম্পর্কযুক্ত নয় সুফিতত্ত্বের মূল শিক্ষা; সুফিতত্ত্বের মূল কথাই হল এই নীতি মেনে চলা যে অপরের প্রতি তুমি সেই আচরণ কর যে আচরণ তুমি চাও অপরেও করুক তোমার সঙ্গে, নিজের জন্য সেই ইচ্ছাই তুমি কর যা তুমি ইচ্ছা কর অপরের জন্য। শুধু তুমি দারিদ্রদের মধ্যে বিতরণ করে দাও তোমার সেইসব জিনিস যা তোমার একান্ত প্রয়োজনের অতিরিক্ত। সেইসব মানুষকেই একান্ত আদরণীয় বলে মনে করতেন তিনি যারা কে কোন্ জাতের বা কোন শ্রেণীর মানুষ তার হিসেব না করে নির্বিচারে সব ক্ষুধিতের মুখে অন্ন দেয়।

টিপ্পনী

ইসলামের মধ্যে সুফি:

খ্রিষ্টীয় অষ্টম শতাব্দী বা আরবদের সিন্ধু অভিযানের শুরু থেকেই এদেশে ইসলামের প্রচার শুরু হয়ে যায়। পর্যায়ক্রমে তার বিভিন্ন স্তর লক্ষ্য করা গেছে। সামাজিক বৈষম্য দূর করে জাতি-ধর্ম-বর্ণ নির্বিশেষে ব্যক্তিমানুষের স্বাধীকার ও সমানাধিকার সব স্তরের মানুষকে আকৃষ্ট করেছিল। এইভাবে এই নতুন একেশ্বরবাদ হিন্দু সন্ন্যাসী ও তান্ত্রিকদের চেয়ে জনগণের কাছে অধিকতর গ্রহণযোগ্য হয়ে উঠেছিল। তবে, ব্রাহ্মণ্য ভারতে ইসলামের প্রবেশ যে খুব সহজেই ঘটেছিল এমনটি নয়। উচ্চবর্ণের ও উচ্চবিত্তের লোকের সাম্যবাদের তত্ত্বে আর্থ-সামাজিক অবস্থার বিপর্যয়ের আশঙ্কায় শঙ্কিত হয়ে পড়েছিল। তাছাড়া চিরায়ত তাঁদের ঐতিহ্য যা কিনা জন্মসূত্রে প্রজন্মক্রমে পেয়ে এসেছিল তাও হারানোর ভয় ছিল। এবং সব মানুষের একত্রে সমাবেশ যার মধ্যে দাস-সেবকও সংযুক্ত ছিল- তা তাদের মান-মর্যাদায় আঘাত হেনেছিল। এক্ষেত্রে দীন-দরিদ্র বা সমাজের নীচু তলার মানুষেরা অবজ্ঞামুক্তির আশায় যেভাবে ইসলামকে বরণ করেছিল তাতে উচ্চশ্রেণী আরো বেশি শঙ্কিত ও দুর্বল হয়ে পড়েছিল। দেখা গেছে মুঘল যুগেও এই ধারা অব্যাহত থেকেছে। কিন্তু শেষের দিকে শীয়া-সুন্নী বাদানুবাদ শুধু মুঘল সাম্রাজ্যের ভাঙ্গনকেই ত্বরান্বিত করল না; সুফি আন্দোলনের মূল 'স্পিরিট'টাকেই অন্ত:সারশূন্য করে দিয়েছিল।

টিপ্পনী

সুফিদের অবদান বা সুফিবাদের প্রভাব

মধ্যযুগে আর্থ-সামাজিক-রাজনৈতিক ক্ষেত্রে সুফিরা এক গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করতে সক্ষম হয়েছিল। স্যার যদুনাথ সরকারের মতে দুটি কারণে সুফি প্রভাবে সমাজ ও রাষ্ট্র প্রভাবিত হয়েছিল। তাঁর মতে সুলতানি সাম্রাজ্যের অবসানের ফলে যে আর্থ-রাজনৈতিক বিশৃঙ্খলার সৃষ্টি হয়েছিল তা সুফি প্রভাবকে বলবর্তী করেছিল। এ রকম পরিস্থিতিতে ভারতীয় অর্থনীতির শিকার দরিদ্র মানুষের কাছে সুফিদের বক্তব্য বিশেষভাবে গুরুত্ব পেয়েছিল। সুফি সন্তরাই দিল্লী সুলতানি যুগের শেষপর্বে যে সামাজিক ও ধর্মীয় সহনশীলতার সূচনা করেছিলেন তা আকবরের শাসনকালে পূর্ণতা লাভ করে। আকবর হিন্দু ৈদের যোগ ও বেদান্তের দর্শন দ্বারাও বিশেষভাবে প্রভাবিত হয়েছিলেন। সম্ভবত এক্ষেত্রে চিস্তি সুফিয়া তাঁর সহযোগী ছিল। এতদ্‌সত্ত্বেও, এই আন্দোলন ব্যর্থতায় পর্যবসিত হয়। অধ্যাপক আশরাফ এর ভাষায় সূক্ষ্ম যুক্তি সুফিদের পক্ষে থাকলেও সমগ্র সগঠিত সমাজের মূল শক্তি ছিল সুলতানের হাতে। সুফি আন্দোলন নতুন রাজনৈতিক ক্রমবিবর্তনে বিশ্বাসী হয়ে উঠতে পারেনি। সন্তরা রাজনীতিতে কোন আগ্রহ দেখানো তো দুরের কথা, তাঁরা সবসময় সুলতানের কাছ থেকে দূরে থাকতেন। তখন সমাজবদ্ধ মানুষের জিজ্ঞাসু নিজেকে বাঁচিয়ে রাখার জন্য যে রুটির প্রয়োজন তার সমাধান হবে কেমন করে বা কার কাছে? সুফিরা এর উত্তরে বলেছিলেন জীবনধারণের জন্য যদি সুলতানের দ্বারস্থ হতে হয়, তাহলে সে জিনিস তারা বাদ দিয়ে চলবে-সুলতানের ঐ কলঙ্কিত হাত থেকে তারা কোন কিছু নিতে রাজি ছিলেন না। এসমস্ত কিছুর সদ্‌ব্যবহার করেছিলেন চক্রান্তকারী উলেমারা। সুফি সন্তদের একদিকে সেই দৃঢ় আত্মপ্রত্যয় অপর দিকে অতীন্দ্রিয় ও গূঢ় রহস্যপূর্ণে নম্রতা পাথেয় জীবনকে করে তুলেছিল ক্রমান্বয়ে নি:সঙ্গ। বহু মানুষের আশা-আকাঙ্খা রাষ্ট্র ধর্মের কাছে একসময় ধরাশায়ী হয়। তখনও সুফিরা নির্ভীক সততার মধ্যে দিয়ে যতই এগিয়ে যেতে থাকলেন ততই শাসকেরা বিমুখ হলেন। এক সময় গোঁড়া মুসলিমের চিরাচরিত ধর্মমতের আক্ষরিক ভাষ্যের কাছে সুফি ধর্মমত প্রায় ব্যর্থ হয়ে যায়। তবে, এই সুফি আন্দোলনের সাফল্য বা ব্যর্থতা সেই সময়ের নিরীখেই আবদ্ধ রাখা ঠিক হবে না। অতীতের ঐতিহ্য বলে ভারতীয় সংস্কৃতির যে ধারা আছে তার অন্বেষণে মধ্যযুগও সেই স্থানের অধিকারী থেকেছে। আশার আলো এই যে প্রয়োজন ভিত্তিক সেখান থেকে আজও আমরা আমাদের মতো করে অন্বেষণ করতে পারি।

২.২.২. ভক্তি আন্দোলন

পটভূমি:

ধর্মের অন্তনির্হিত আর সত্ত্বাটি বিকশিত হয় যথার্থ প্রচারের মধ্য দিয়ে। সেটি উক্ত অবস্থায় থাকে জটিল দর্শনের মধ্যে সেটিই আবার সন্তদের মাধ্যমে অতি সহজ সরল ও প্রাঞ্জল ভাষায়-সাধারণের কাছে পৌছে যায়। মানুষের মুক্তি সন্ধানে হিন্দু ধর্মে দুটি তত্ত্ব আছে; যার মধ্যে বেদান্ত একটি। দক্ষিণ ভারতের ক্ষেত্রে দেখা যায় শৈব মতাবলম্বী ব্রাহ্মণ শঙ্কর অত্যন্ত সঠিকভাবেই কালজয়ী বেদান্তকে তুলে ধরে ছিলেন। উপনিষদের পরস্পর বিরোধীর অবসান ঘটিয়ে একটি সুসমঞ্জস্যর ধারণা ও ব্যাখ্যা দিয়েছিলেন তিনি। ধর্ম ও চিন্তার জগতে শংকরের স্থানের সঙ্গে সেন্ট টমাস অ্যাকুইনাসের স্থান নিয়ে তুলনা করা হয়ে থাকে। শংকরের মতবাদ অদ্বৈত মতবাদ রূপে আখ্যায়িত। অনেক সময় সেটিকে কেবলা দ্বৈতও বলা হয়ে থাকে। তাঁর দর্শনে উঠে এসেছে সত্য উচ্চতম স্তরে ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য এবং এই বিশ্বজগৎ অবাস্তব ও অসার। এমনকি দেবতারাও তাই। এখানে ব্রহ্মাই একমাত্র সত্য। আর রামানুজের দৃষ্টিতে পাপ করলে কেউ যদি প্রকৃত অনুতপ্ত হয় তাহলে তার কর্মফলের প্রয়োজন হয় না। ঈশ্বর তাকে এমনি এমনি কাছে টেনে নেবে। রামানুজের ঈশ্বরের প্রয়োজন মানুষকে, আর অনুরূপভাবে মানুষের প্রয়োজন ঈশ্বরকে। মোটামুটি ৮৫০ থেকে ৯৫০ খ্রিষ্টাব্দের মধ্যবর্তী সময়ে তামিলভূমিতে 'ভাগবত পুরাণের' সংকলনের মধ্য দিয়ে ভক্তির ধারা ছড়িয়ে পড়েছিল প্রায় সর্বস্তরের মানুষের মধ্যে। ভাগবত পুরানে মানুষের মধ্যে স্থিত ঈশ্বর ও তাঁর সন্তান সম্পর্কে মানুষকে অবহিত করা হয়েছে। এইভাবে ভক্তির অজস্রধারা থেকেই ভক্তি আন্দোলন হিন্দুধর্মে একটি বিশিষ্ট স্থান পেল।

টিপ্পনী

ভক্তি আন্দোলনের ধারা :

সংক্ষেপে আলোচনা করলে দেখা যায় কৃষ্ণ, রাম বা শিবের উপরে দেবত্ব আরোপের মধ্য দিয়েই ভক্তি আন্দোলন ব্রাহ্মণের নেতৃত্ব ও প্রাধান্যকে সমূলে উৎপাটন করেছিল। একইসঙ্গে গুরুর ঐশ্বরিক মহীমাকেও অস্বীকার করা হয়েছিল। যে কেউ যে কোন বর্ণের মানুষকে গুরু হিসাবে গ্রহণ করতে পারতেন। এক্ষেত্রে গুরুর ঐতিহাসিক তকমার প্রয়োজন ছিল না। বস্তুত আন্দোলনের শিকড় প্রথিত ছিল মনে-তার চিন্তা ও চেতনায়। ভক্তি শুধু ঈশ্বর বা দেবতা কেন্দ্রিক ছিল না-সমাজের সর্বস্তরের মানুষের ক্ষেত্রে তার বাস্তবরূপ ফুটে উঠেছিল। দশম ও একাদশ শতাব্দী থেকে বিশেষত উত্তরভারত কেন্দ্রিক ভক্তিগীতি ও স্তবগাথার সংমিশ্রণ লক্ষ্য করা যায়। এখানে ভক্তির আবেদনের সুরটি তাঁদের কাছে একান্ত গভীরে নিহিত ছিল। এক্ষেত্রে জ্ঞানেশ্বরের নাম খুবই উল্লেখযোগ্য হিসাবে বিবেচিত। তার সমসাময়িক ছিলেন নামদেব। সমাজের চোখে তাঁর জন্মজাত বংশ ছিল নীচু; আজও সেই রেওয়াজ বর্তমান। তবে, চিন্তা চেতনায় ঘটেছে আমূল পরিবর্তন যে কেবল ছাঁচটাই থেকে গেছে। তাঁর আন্দোলনে দেখা গেছে সমতার বাণি। সমাজের শ্রেণীভেদ ও জাতিভেদের মূলে হেনেছে কুঠারাঘাত। উঠে এসেছে সমাজের নীচু তলার মানুষ। এদের মধ্যে গোরা ছিলেন জাতিতে কুম্ভকার, সম্বত ছিলেন মালী, চোখা ছিলেন অচ্ছুৎ বা সেনা ছিলেন নাপিত। প্রত্যেকের সঙ্গে নামদেবের সম্পর্ক ছিল আত্মীক এবং তাঁরা সকলেই তাঁর বন্ধুস্থানীয়। একইভাবে ভক্তি আন্দোলনের নেতৃত্বে এগিয়ে এসেছিলেন সাধক একনাথ, কবি তুকারাম মারাঠি কবি ও সন্ত রামদাস। এঁরা সকলেই সংকীর্তন বা কৃষ্ণভক্তি বা রামভক্তির মধ্য দিয়ে সমাজের নীচুতলার মানুষের কাছে কেবল পৌছাননি সকলের মধ্যে থেকে যেন তাদেরই প্রতিনিধিত্ব করেছেন। সমাজের বিভাজনের প্রাচীর ভাঙ্গতে ভাঙ্গতে তা যেন আর থেকেও থাকল না। প্রথম দিকে মননে তারপর চেতনায় সর্বশেষ বাস্তবের সেই সীমারেখার ক্রমশ সংকুচিত হয়ে অপ্রয়োজনীয় হয়ে পড়ল। এইভাবেই যে কেউ অপর একজনের মনে জায়গা করে নিতে পেরেছিল জাতি-ধর্ম-বর্ণের অলীক প্রাচীর ছিন্ন করে।

বাংলাতে ভক্তি আন্দোলন :

বাংলাতেও ভক্তি আন্দোলনের জোয়ার ছাপিয়ে পড়েছিল বিশেষত চৈতন্যের (১৪৮৫-১৫৩৩) মদ্য দিয়ে। তাঁর কৃষ্ণ আরাধনার পথটাই ছিল উন্মুক্তে সমবেত কীর্তন। এই নামগান মন্দির বা গৃহের মধ্যে আবদ্ধ ছিল না। উন্মুক্ত রাজপথও তার সাক্ষী থেকেছে। চৈতন্যর দৃষ্টিতে যে কৃষ্ণ তাকে কেন্দ্র করেই কয়েকশ বছর ধরে বাংলা সাহিত্যে স্তবগীতি, লোকগাথা, উপকথা ও নাটক একের পর এক রচিত হয়েছে। আজও সে বাউলের গীতি সর্বত্রই কম বেশি শোনা যায় সেই বাউলের জীবনযাত্রা ও দৃষ্টিভঙ্গি গড়ে উঠেছিল চৈতন্য-ভাবধারা থেকেই। এর উৎসস্থল নদীয়া। পরে এর প্রসার ঘটে সমগ্র বাংলায়। হিন্দু বা মুসলিম যে ভাবধারাই হোক না কেন বাউলরা সবাই ছিলেন মনের মানুষ।

টিপ্পনী

রামানন্দ ও কবীর:

পঞ্চদশ শতাব্দীতে হিন্দীভাষী অঞ্চলে রামানন্দের নেতৃত্বে ভক্তি আন্দোলন এক নতুন মোড় নিল। দৃঢ়ভাবে প্রতিবাদ করলেন জাতিভেদজনিত অবিচারকে। জাতের কুসংস্কার যেমন ছিল তাঁর আন্দোলনে তেমনই ছিল উচ্চবর্ণের দৈনন্দিন ক্রিয়াকলাপ ও আচরণ বিধীর ওপর তীব্র ধিক্কার। আর এ সব আকাশে-বাতাসে ধ্বনিত হয়েছিল তার গানের মধ্য দিয়ে। তাঁরই এক অন্যতম শিষ্য হলেন কবীর। তাঁর ঘোষণা-

“ নই আমি হিন্দু বা মুসলিম
আল্লা রাম আমার এ দেহের নিঃশ্বাস।”

আসলে তাঁর এই ঘোষনাই ছিল জীবনচরিত। তাকে জানতে বা বুঝতে এর চাইতে আর ভালো কিছু ব্যাখ্যা হতে পারে না। জীবনের শেষ দিন পর্যন্ত কবীর ভক্তির যে রস সঞ্চারিত করে গেছেন তা দলমত নির্বিশেষে সকল মানুষকে একইসূত্রে আবদ্ধ করেছে। তাতে নেই কোন বিভেদ, নেই বৈষম্য কেবলই বন্ধন যা কিনা ভক্তির। কবীরের মৃত্যুর পরও তাঁর আন্দোলন থেমে ছিল না তাঁর মুখ নিঃসৃত দোঁহাগুলি শিষ্যরা কেবল কণ্ঠস্থই করতেন না পরবর্তীকালে গ্রন্থিতও করে ছিলেন। আসলে স্থান-কাল ভেদে কবীর এমনভাবে ভক্তিবাদী কবির হয়ে উঠলেন তা সত্যই বিস্ময়। আর ঐ আসল শক্তি নিহিত এককে নয় বরং ঐক্যে। এই ছিল তার ভক্তিবাদের আন্দোলন। রাম-রহিমের তফাৎ কিছু ছিল না।

গুরু নানক:

শিখ ধর্মের প্রবর্তক গুরু নানক কবীরের মতোই হিন্দু ও মুসলমান ধর্মের মেলবন্ধন চেয়েছিলেন। নানক উত্তরে কাশ্মীর, দক্ষিণের সিংহল, দক্ষিণভারত, মক্কা ও বাগদাদ পর্যন্ত গমন করেছিলেন। কবীরের ন্যায় তিনিও মূর্তিপূজা, ধর্মের আচার-অনুষ্ঠান ও বর্ণভেদের তীব্র নিন্দা করেছেন। নানক ছিলেন একেশ্বরবাদ। তাঁর সম্পর্কে একটি উদ্ধৃতি তাঁর পরিচয়ের সাক্ষ্য বহন করে, “He believed in God, without form in the doatrine of Karma and in the transmigration of Souls.To him, the attainment of Salvation, of identiting with the absolute, was the good of human life.”

তুলসীদাস :

তুলসীদাস রামকে ঈশ্বরের অবতার রূপে দেখেছিলেন। তিনি মনে করতেন একমাত্র ভক্তি ও প্রেমের দ্বারাই ঈশ্বরের সান্নিধ্য লাভ করা যায়। তাই গবেষক Chitmis লিখেছেন, “If Kabir promoted the yuga Dharma, Tulsidasa vindicated the Sonatana

Dharma.” তাঁর রচিত ‘রামচরিতমানস’ গ্রন্থ নৈতিক ও আধ্যাত্মিক মূল্যের এক অন্যতম নিদর্শন। এছাড়া, তাঁর রচিত ‘রামায়ণ’ সমগ্র উত্তর থেকে দক্ষিণ ভারতে জনপ্রিয়তা লাভ করেছে। গ্রীয়ারসন তাঁর ‘‘Tulsidasa, Poet and Religious Reformer” নামক গ্রন্থে রামচরিতের জনপ্রিয়তা সম্পর্কে বলতে গিয়ে লিখেছেন, ‘‘The whole of the Gangetic valley this work is better known than the Bible is in England.” তুলসীদাসের কাছে সমস্ত কিছুর কেন্দ্রাস্থিত ছিল ভক্তি। এর মধ্য দিয়ে তিনি ভগবানের প্রতি অনন্ত প্রেমে বিশ্বাসী হয়ে উঠেছিলেন।

টিপ্পনী

দাদু-দয়াল, সুরদাস ও মীরাবাঈ:

কবীরের মতো দাদু-দয়ালের জন্মবৃত্তান্ত ছিল রহস্যাবৃত। জানা যায় রামানন্দ গোষ্ঠীর একজন গুরুর কাছে তিনি দীক্ষা নিয়েছিলেন। তিনি না হতে চেয়েছিলেন হিন্দু, না মুসলমান-তিনি কেবল দয়াময়কেই চেয়েছিলেন। তিনি হিন্দু-মুসলমানের মধ্যে কোন বিভেদ দেখেননি-মননের মেলবন্ধনের কথাই বলেছেন।

সুরদাস প্রধানত কৃষ্ণভক্তির দ্বারা ভক্তিবাদের সূচনা ঘটান। সঙ্গীত ও কাব্যের মধ্য দিয়ে তিনি কৃষ্ণভক্তি প্রকাশ ও প্রচার করেছিলেন। তাঁর কাব্য জাতি-ধর্ম-বর্ণর গন্ডী অতিক্রম করে সর্বজীবের প্রেম ও ভালোবাসার দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছে।

মধ্যযুগের ভারতে মীরাবাঈ ছিলেন একজন অন্যতম সর্বশ্রেষ্ঠ নারী সন্ত। তিনি ছিলেন বল্লভ ও চৈতন্যের ভক্তিবাদের অনুগামী। গবেষক কে.এ.চিটনিস লিখেছেন-‘‘ She was also a gifted poetess who compossed in virjabhasa, rajasthani and Gujrati Several popular devotional poems of absorbing interest and enduring devotation.”

ভক্তিবাদের প্রভাব:

ভারতবর্ষে ভক্তি আন্দোলন চিন্তা, চেতনা, ভাবনার মধ্যেই সীমাবদ্ধ থাকেনি; তার বহুধা বিস্তার ঘটেছিল। এর ফলেই শুরু হয় সামাজিক, রাজনৈতিক ও সাংস্কৃতিক সংস্কার। কমে আসে বর্ণবৈষম্যের ব্যবধান। সামাজিক ও সাংস্কৃতিক ক্ষেত্রে ঘটে আমূল পরিবর্তন। মর্তপ্রীতিরোহিত এই আন্দোলন বর্ণ-ধর্ম নির্বিশেষে সকল স্তরের মানুষকে এক করতে পেরেছিল। আবার, চৈতন্যের বৈষ্ণবধর্ম প্রচারের ফলে ‘আধ্যাত্মিক গণতন্ত্র’-র পরিবেশ সৃষ্টি হল তাতে অন্তত ধর্ম সাধনার ক্ষেত্রে জাতবিচারের আর গুরুত্ব রইল না। তবে, গৌড়ীয় বৈষ্ণবধর্মের ভাবানুতা ও নীতিহীনতা বা সহজিয়া বৈষ্ণব ধর্মের ধর্মাচার ও অবাধ নারীসঙ্গ বিভিন্নভাবে আলোচিত হয়েছে। এতদ্‌সত্ত্বেও মানুষের জড়তা কাটিয়ে মানুষকে যথার্থ রূপ দিতে-চিন্তা, চেতনা, ভাবনার জগতের মধ্য দিয়ে সমাজে বৈপ্লবিক পরিবর্তন এসেছিল।

সুফি ও ভক্তিবাদের উদারনৈতিক সমন্বয়:

ইসলাম ধর্মের যে সমতা ও একেশ্বরবাদ তা হিন্দু রক্ষণশীলতার মূলে পরোক্ষে কুঠারাঘাত করেছিল। হিন্দু ধর্মের কুসংস্কারের খোলসটি ধীরে ধীরে ভাঙ্গতে শুরু করল উদার হিন্দু ধর্মাচার্যগণ। এর কম প্রেক্ষাপটে উভয় সম্প্রদায়েই উদারনৈতিক নতুন এক ধর্মীয় আন্দোলনের সূচনা ঘটে। তবে, ভারতবর্ষে ভক্তিধর্মে সুফিবাদের প্রভাব ও বিকাশ নিয়ে পন্ডিত মহলে পৃথক দুটি দৃষ্টিভঙ্গি উঠে এসেছে। একদল বিশেষজ্ঞের মতে ভক্তিধর্মের উদ্রব ঘটেছিল ভারতীয় দর্শন থেকেই। অপরদিকে আর একদল পন্ডিতের মতে, ভক্তিধর্ম আন্দোলনের উদ্ভব ঘটেছিল একটি বহু

সাংস্কৃতিক উৎসজাত থেকে। এই বিতর্কের মধ্যে না গিয়ে বলা যায় যে, সুফি সাধকদের জীবন-সাধনার সঙ্গে ভক্তিবাদী সন্তদের অনেক মিল ছিল।

কবীর, নানক বা চৈতন্যদেব হিন্দু ও মুসলমান ধর্মের সমন্বয় করতে চেষ্টা করেছিলেন। কবীর রাম ও রহিমের মধ্যে কোন পার্থক্য রাখেননি। নানক হিন্দু ও ইসলাম ধর্মের সবকিছুতেই সুন্দর বলে প্রচার করেছিলেন। এবং চৈতন্যদেবও সমাজের জাতিভেদ বা সমাজের কোন বন্ধন মানতেন না।

টিপ্পনী

সুফি রাবিয়া এবং সুফি মনসুরও প্রচার করেছিলেন প্রেমের মধ্যেই ঈশ্বর ও মানুষের মিলন সেতু। এছাড়া দৃষ্টান্তস্বরূপ সুফি আবু ইয়েজিদের কথাও তুলে ধরা যায়। তাঁর অভিমত ''সাপের মতো আমরাও আমাদের খোলস পরিত্যাগ করে গভীর মনোযোগ সহকারে সব লক্ষ্য করি। কোনো প্রভেদ আমরা পাইনি প্রেমিক, প্রেমিকা ও প্রেমের মধ্যে। ঐশ্বরিক ঐক্যচেতনার রাজ্যে তারা সব এক।''

উপসংহার:

পরিশেষে বলা যায় যে, কোরান হাফিসের ইসলামে পীর বা গুরুবাদ নেই। গ্রীক, বৌদ্ধ ও উপনিষদের প্রভাবে সুফিতত্ত্বের উদ্ভব ঘটে ইরাক, ইরান, মিশর ও মধ্য এশিয়ায়। এক্ষেত্রে, হিন্দুধর্মে যখন উদার ভক্তিবাদী সংস্কার আন্দোলন চলেছিল মুসলমান ধর্মে তা বহু পূর্বেই শুরু হয়ে গিয়েছিল। তবে, উভয় আন্দোলনে মানুষের মধ্যে ভেদাভেদ দূর করে যে সংস্কারমূলক কর্মসূচী নেওয়া হয়েছিল তা নি:সন্দেহে বৈপ্লবিক।

প্রশ্নাবলী

১. সুফি আন্দোলনের ওপর একটি প্রবন্ধ লিখুন।

২. ভক্তি আন্দোলন সমগ্র ভারতে কীভাবে ছড়িয়ে পড়েছিল?

৩. ভারতীয় সংস্কৃতিতে সুফি ও ভক্তি আন্দোলনের প্রভাব সম্পর্কে আলোচনা করুন।

৪. ভক্তি ও সুফিবাদের তুলনামূলক আলোচনা করুন।

সংক্ষিপ্ত :

১. 'সুফি' শব্দটি কোন ভাষা থেকে উদ্ভূত?

২. 'হানাফি' সম্প্রদায় কারা?

৩. 'খানকাহ' বলতে কী বোঝেন?

৪. সিলসিলা কী?

৫. আবু ইয়েজিদ কে?

৬. সামাজিক ক্ষেত্রে সুফিদের একটি অবদান লিখুন।

৭. হিন্দুধর্মে তত্ত্বের সংখ্যা কয়টি?

৮. চৈতন্যের সময়কাল উল্লেখ করুন।

৯. রামানন্দ কে ছিলেন?

১০. 'রামচরিতমানস' কার রচনা?

১১. দাদু-দয়াল কে ছিলেন?

১২. গুরুবাদ কোনধর্মে অনুপস্থিত?

গ্রন্থপঞ্জী

১. S.A.A.Rizvi-'The Wonder that was India'vol-II. গ্রন্থের বাংলা অনুবাদ।(বেশিরভাগ সংগৃহীত মূল আলোচনার জন্য)

২. R.C. Majumder et al (Ed) History and Culture of Indian People V.I.II & III

৩. Tara Chand, Influence of Islam on Indian Culture.

৪. আহমেদ শরীফ, বাংলার সুফি

৫. তেসলিম চৌধুরী, ভারতের ইতিহাস, আদি মধ্যযুগ থেকে মধ্যযুগে উত্তরণ।

- 'পির' বা 'খাজা' – সুফি গুরু।
- 'দরগা' বা 'খানকা' – পিরের কর্মকেন্দ্র।
- 'ফকির' বা 'দরবেশ' – সুফি ধর্মের অনুগামী।
- সুফি সাধনার দশটি স্তর – ১) 'তত্তবা' অর্থাৎ প্রায়শ্চিত্ত বা অনুশোচনা, ২) 'ওয়ারা' বা নিবৃত্তি অর্থাৎ লোভ ও তৃষ্ণা দমন, ৩) 'ফকর' বা আনন্দের সঙ্গে দারিদ্র্য বরণ, ৪) 'সরব' বা সহনশীলতা অর্জন, ৫) 'শুকর' বা কৃতজ্ঞতা প্রদর্শন, ৬) 'খুফ' বা অন্যায় ও পাপকে ভয় করা, ৭) 'রজা' আল্লাহর করুণা লাভের আকাঙ্খা, ৮) 'তয়াক্কুল' বা ভালো-মন্দ সব কিছু হাষ্টমনে গ্রহণ, ৯) রিজা বা ঈশ্বরে আত্মসমর্পন এবং ১০) 'জুহুদ' বা নৈতিক নিয়মবিধি পালন।
- ভারতে বিস্তি সম্প্রদায়ের প্রতিষ্ঠাতা – খাজা মৈনুদ্দিন চিস্তি।
- 'চিরাগ-ই-দিল্লি' বা দিল্লির আলো – নাসিরউদ্দিন চিরাগ।
- সুহ্রাবর্দি সন্ত – শেখ শিহাবউদ্দিন সুহ্রাবর্দি ও হামিদউদ্দিন নাগোরি।
- পঞ্চদশ শতকে ভারতে পাঁচটি সুফি সম্প্রদায় – কাদিরি, ফিরদৌসি, শাতারি, পক্শবন্দি ও মাজারি।
- চিস্তি সপ্ত – শেখ কুতুবউদ্দিন বক্তিয়ার কাফি ও নিজামউদ্দিন আউলিয়া।
- সুফিবাদ – মুসলিম ধর্মের উদারনৈতিক সংস্কার আন্দোলন মতবাদ।
- বা-শরা – যে সুফি সাধকরা ইসলামীয় নিয়ম শৃঙ্খলা বা শরা অনুসরণ করতেন।
- বে-শরা – যে সুফিরা ইসলামীয় নিয়ম শৃঙ্খলায় আবদ্ধ না থেকে স্বাধীননভাবে অন্তরের বিকাশে বিশ্বাসী ছিলেন তাদের বে-শরা বলা হত।
- সিলসিলা – সুফি সাধকদের বিভিন্ন গোষ্ঠী।

টিপ্পনী

- সমা – উদার সুফিদের বিশেষ সংগীত ও নৃত্য চর্চা।
- ফণা – চিস্তি সাধকদের সাধনার বিশ্বাস (সাধনার মাধ্যমে ঈশ্বরের মধ্যে লীন হয়ে যাওয়া)।
- ভারতে নকশবন্দী সুফিবাদের প্রথম প্রচারক – খাজা বাকী বিল্লাহ।
- মহবুব-ই-ইলাহী (ঈশ্বরের প্রিয়পাত্র) নামে পরিচিত – নিজামউদ্দিন আউলিয়া।
- রামানুজ – ভক্তি ধর্মের আদি প্রচারক।
- 'রামাৎ বৈষ্ণব' সম্প্রদায়ের প্রতিষ্ঠাতা – রামানন্দ।
- রামানন্দের শিষ্য – রবিদাস (মুচি), কবীর (জোলা), সোনা (নাপিত), সাধন (কসাই)।
- 'কবীরপন্থী' – হিন্দু-মুসলিম উভয় ধর্মের মানুষই কবীরের শিষ্যত্ব গ্রহণ করেছিল। এঁরা 'কবীরপন্থী' নামে পরিচিত।
- গুরু নানক – শিখ ধর্মের প্রবর্তক।
- শিখ – নানকের শিষ্যরা 'শিখ' নামে পরিচিত।
- গ্রন্থসাহেব – শিখদের পবিত্র ধর্মগ্রন্থ।
- ঈশ্বরপুরী – শ্রীচৈতন্যের গুরু।
- 'গৌড়ীয় বৈষ্ণব ধর্ম' – শ্রীচৈতন্যের প্রচারিত ধর্মমত।
- ভগদ্গীতা ও ব্রহ্মসূত্রের টীকা রচয়িতা – বল্লভাচার্য।
- 'শুদ্ধ অদ্বৈত' গ্রন্থের রচয়িতা – বল্লভাচার্য।
- মীরাবাঈ – শিশোদিয় রাজপরিবারের বধূ তথা মেবারের রানা সঙ্গের পুত্রবধূ।
- 'মীরার ভজন' – মীরাবাঈ-র ভক্তিমূলক গান।
- 'বিশিষ্ট দ্বৈত' মতবাদের প্রচারক – রামানুজ।
- নগর সংকীর্তন প্রথার প্রবর্তক – শ্রীচৈতন্য।
- কবীরের অনুগামী – 'কবীরপন্থী'।
- দোঁহা – ভক্তিবাদী কবীরের দুই পংক্তির এক একটি পদ।

পর্যায় ২.৩. সমাজ-সংস্কৃতির সংস্কার আন্দোলনে রাজা রামমোহন রায়, বিদ্যাসাগর, দয়ানন্দ সরস্বতী, জ্যোতিবা ফুলে এবং আম্বেদ কর

একক ২.৩.১. রাজা রামমোহন রায় (১৭৭২-১৮৩৩ খ্রিষ্টাব্দ)

- সূচনা
- তৎকালীন সামাজিক অবস্থা
- সমাজ সংস্কার
- শিক্ষা ও সমাজ কল্যাণের ভাবনা
- ধর্ম সংস্কার
- উপসংহার

একক ২.৩.২. ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর (১৮২০-১৮৯১ খ্রিষ্টাব্দ)

- পটভূমি
- সমাজ সংস্কার
- ধর্ম সংস্কার
- শিক্ষা ও সমাজভাবনা
- উপসংহার

একক ২.৩.৩. দয়ানন্দ সরস্বতী (১৮২৪-১৮৮৩ খ্রিষ্টাব্দ)

- সূচনা
- মতাদর্শ ও তার প্রতিষ্ঠানিকতা
- সমাজ সংস্কার ও গঠনমূলক কাজ
- উপসংহার

একক ২.৩.৪. জ্যোতিবা ফুলে (১৮২৭-১৮৯০ খ্রিষ্টাব্দ)

- সূচনা
- স্কুলজীবন থেকেই প্রতিবাদী
- সত্যশোধক সমাজ ও অতীত মহারাষ্ট্র
- উপসংহার

একক ২.৩.৫. বি.আর. আম্বেদকর (১৮৯১-১৯৫৬ খ্রিষ্টাব্দ)

- সূচনা
- লেখনীর মাধ্যমে প্রতিবাদ ও বৌদ্ধধর্মের প্রভাব

টিপ্পনী

- দ্বৈত ভূমিকা
- উপসংহার

২.৩.১. রাজা রামমোহন রায় (১৭৭২-১৮৩৩ খ্রিষ্টাব্দ)

সূচনা:

টিপ্পনী

রামমোহনের পাশে আধুনিকতা শব্দটি রখলে যথার্থ তাঁর পরিচয় উদ্ঘাটন করতে পারে। তিনিই সেই মণিষা যিনি পাচ্য ও পাশ্চাত্যের মেলবন্ধন ঘটিয়ে ছিলেন। এক কথায় যা কিছু ভালো তার নির্যাস নিতে শিখিয়ে দিলেন। এতে কোন স্থান-কাল বা সীমারেখা বেড়া হয়ে ওঠেনি; সর্বোস্তই মনের বিচরণ যেমন হয়ে ওঠে; ভালো কিছু নেওয়ার ক্ষেত্রটাও সেরূপ। তৎকালীন ভারতীয় সমাজের জড়ত্ব ও সমকালীন দুর্নীতি-জাতপাতের বিচার সমস্ত কিছুই তাঁর হৃদয়কে নাড়া দিয়েছিল। ভারতবাসী-যুক্তিবাদ, বৈজ্ঞানিক মনোভাব ও মানবতাবাদের আদর্শে উদ্বুদ্ধ হয়ে সমাজের সকল শ্রেণীর সম-অধিকার প্রতিষ্ঠা করুক এই ছিল তাঁর অভিপ্রায়। ক্রমে ক্রমে তার বাস্তব রূপও সুপ্রতিষ্ঠিত হয় রেনেসাঁর মধ্য দিয়ে। তিনিই প্রথম পুরুষ 'ভারত পথিক' নবযুগের পথিকৃৎ এবং আধুনিক।

তৎকালীন অবস্থা:

আধুনিক ভারতের জন্মদাতা হিসাবে রামমোহন রায়ের ভূমিকা ও অবদান সম্পর্কে বিতর্ক থাকলেও বেশিরভাগ পন্ডিত ও ঐতিহাসিক তাঁর প্রশংসাই করেছেন। একথা মাথায় রাখা দরকার তিনি যে সময়ে সে পরিবেশ ও পারিপার্শ্বিক পরিস্থিতির মধ্যে সংগ্রাম চালিয়েছিলেন তা মোটেও সহজ ব্যাপার ছিল না। তিনি প্রকৃত অর্থে যুগধর্মকে ছাপিয়ে যেতে যথার্থ সক্ষম হয়েছিলেন। রামমোহনের জন্মলগ্নে বাংলার অবস্থা বর্ণনা করতে গিয়ে রবীন্দ্রনাথ লিখেছিলেন- '' শত শত বৎসর চলে গেল-ইতিহাসের পুরোগামিনী গতি হল নিস্তব্ধ। ভারতবর্ষের মনোলোকে চিন্তার মহানদী গেল শুকিয়ে। তখন দেশ হয়ে পড়ল স্থবির, আপনার মধ্যে আপনি সংকীর্ণ, তার সজীব চিত্তের তেজ আর বিকীর্ণ হয় না দূর দূরান্তরে। শুকনো নদীতে যখন জল চলে না, তখন তলাকার অচল পাথরগুলো পথ আগলে বসে; তারা অসংলগ্ন, তারা অর্থহীন, পথিকের তারা বিঘ্ন, তেমনি দুর্দিন যখন এল এই দেশে তখন জ্ঞানের চলমান গতি হল অবরুদ্ধ, নির্জীব হল নবনবোন্মেষশালিনী বুদ্ধি, উদ্ধত হ'য়ে দেখা দিল নিশ্চল আচারপুঞ্জ, আনুষ্ঠানিক নিরর্থকতা, মননহীন লোকব্যবহারের অভ্যস্ত পুনরাবৃত্তি। সর্বজনের প্রশস্ত রাজপথকে তারা বাধাগ্রস্ত করলে। খন্ড খন্ড সংকীর্ণ সীমানার বাইরে বিচ্ছিন্ন করলে মানুষের সঙ্গে মানুষের সম্বন্ধকে।'' জাতির এই চরম সংকট মুহূর্তেই তাঁর আবির্ভাব।

সমাজ সংস্কার:

সমাজ সংস্কার আন্দোলনের সবচেয়ে বড় ভীতি সতীদাহ প্রথার বিরুদ্ধে আন্দোলন। শ্রীরামপুরের মিশনারী বা ব্রিটিশ সরকারের কিছুটা তৎপরতা থাকলেও হিন্দু ধর্মাচারণের জটিলতায় তা আটকে থেকেই গিয়েছিল। ফলে অসহায় বিধবা রমনীদের রক্ষা করার কেউ ছিল না। পরিসংখ্যানে উঠে আসে ১৮১৫ থেকে ১৮১৮ খ্রিষ্টাব্দের মধ্যে ২৩৬৫ জন বিধবাকে দাহ করা হয়। এই সময়েই রামমোহন সতীদাহ প্রথা রদ করার আন্দোলনে ঝাঁপিয়ে পড়েন। ১৮১৮ খ্রিষ্টাব্দে বাংলা পুস্তিকা ও তার ইংরাজী অনুবাদ করে ইংরেজ শাসক সম্প্রদায়ের মনে এই ধারণার সৃষ্টি করেন সতীদাহ প্রথার পিছনে হিন্দু ধর্মশাস্ত্রের কোন বিধান নেই। তিনি মনুসংহিতা ও অন্যান্য শাস্ত্র থেকে উদ্ধৃতি তুলে দেখান যে, হিন্দু বিধবাদের পবিত্র ও সংযমী জীবনযাপন

করতে নির্দেশ দেওয়া হয়েছিল, তাদের ধ্বংসের কোন বিধান দেওয়া হয়নি। সতীদাহ প্রথাকে কেন্দ্র করে তর্কের ঝড় কম ওঠেনি। কিন্তু প্রত্যেক ক্ষেত্রটিকে রামমোহন তথ্যসহকারে বৈজ্ঞানিক যুক্তির দ্বারা খন্ডন করতে সক্ষম হয়েছিলেন। তিনি আইনি নয়; লোকশিক্ষার মাধ্যমে এই সামাজিক পরিবর্তন ঘটবে আশাবাদী ছিলেন। রামমোহনের সঙ্গে বেন্টিকের এবিষয়ে মতপার্থক্য লক্ষ্য করা যায়। ১৮২৯ খ্রিষ্টাব্দে ১৭ নং রেগুলেশন জারী করে বেন্টিক সতীদাহ প্রথা নিষিদ্ধ করলে রামমোহন তাঁকে অকুণ্ঠ সমর্থন জানান। তিনি বার্তা মারফৎ বেন্টিককে অভিনন্দনও জানান। এক্ষেত্রে স্মরণে রাখা দরকার রামমোহনের আন্তরিক প্রচেষ্টা, জনমত গঠনে ঐকান্তিক প্রয়াস ও বেন্টিকের প্রতি অকুণ্ঠ সমর্থন–সবকিছু মিলিয়েই এসেছিল সফলতা। এছাড়া নারীদের অর্থনৈতিক অধিকার ও বিভিন্ন দাবীর প্রশ্ন নিয়েও তাঁর সোচ্চারতা কম দেখা যায়নি। স্বামী বা পিতার সম্পত্তিতে নারীর কোন অধিকার ছিল না। এই অন্যায়ের বিরুদ্ধে তিনি প্রতিবাদ জানিয়ে লিখলেন, ‘‘Modern encroachment on the ancient rights of hindu females according to Hindu law of inheritence.’’ রামমোহন প্রাচীন শাস্ত্রের উল্লেখ টেনে বলেন মৃত স্বামীর সম্পত্তিতে স্ত্রীর পূর্ণ অধিকার আছে। পুরুষের বহুবিবাহের বিপক্ষে যেমন তিনি কলম ধরেছিলেন তেমনি সোচ্চার হয়েছিলেন জাতিভেদ প্রথার বিরুদ্ধে। তিনি লিখেছিলেন–‘‘The distinction of castes introucing innumerable division and subdivisions among them has entirely deprived them of patriotic feeling, and the multitude of religious rites and ceremonies and the law of purification have totally disqualified them from undertaking any difficult enterprise.’’

টিপ্পনী

শিক্ষা ও সমাজকল্যাণের ভাবনা:

রামমোহন শিক্ষাকে জাগতিক ও সমাজ কল্যাণের মাধ্যম হিসাবে দেখতেন। পাশ্চাত্য বিজ্ঞান, রাষ্ট্রনীতি, অর্থনীতি, আইন প্রভৃতি আধুনিক শিক্ষার মাধ্যমে ভারতকে আধুনিক চিন্তাধারার সঙ্গে পরিচিত করে তোলার প্রয়োজনীয়তা সম্পর্কে তিনি প্রবল সচেতন ছিলেন। পাশ্চাত্য শিক্ষা দীক্ষা ও আদর্শ গ্রহণ করার জন্য তিনি ভারতে ‘‘ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদের বিকাশ’’ কাম্য বলে মনে করেছিলেন। তিনি ইংরেজী শিক্ষার প্রযোজনীয়তা সম্পর্কে দৃঢ় প্রত্যয় ছিলেন। আলেকজান্ডার ডাফ যখন কলকাতার ইংরাজী জন্য একটি স্কুলবাড়ীর খোঁজ করছিলেন, রামমোহন তখন তাঁকে শুধু স্কুলবাড়ীর ব্যবস্থাই করে দেননি, ছাত্র জোগাড়ের দায়ভারও গ্রহণ করেছিলেন। তাঁরই ঐকান্তিক প্রচেষ্টা, উৎসাহ ও সক্রিয় ভূমিকায় গড়ে ওঠে বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠান। স্ত্রী শিক্ষা বিষয়ে তাঁর পরোক্ষ প্রয়াসও লক্ষ্য করা যায়। রাজনীতির ক্ষেত্রেও রামমোহনের আদর্শ ছিল প্রগতিশীল। এছাড়া, রাষ্ট্রচিন্তা ও আন্তর্জাতিক দৃষ্টিভঙ্গীতে তাঁর সমসাময়িক ইউরোপীয় যুক্তিবাদী দর্শনের প্রভাবও উঠে এসেছে।

ধর্মসংস্কার:

রামমোহনের ধর্মীয় সংস্কার আন্দোলনের প্রধান বৈশিষ্ট্য হল হিন্দু ধর্মের মূল ঐতিহ্য থেকে বিচ্যুত না হওয়া। তিনি হিন্দু ধর্মের যা কিছু কুসংস্কার যা ভিতর থেকে দূর করতে চেয়েছিলেন। অধ্যাপক দিলীপ কুমার বিশ্বাস ‘‘রামমোহন সমীক্ষা’’ গ্রন্থে লিখেছেন, রামমোহনের ধর্মীয় চেতনায় লোকহিত ও সমাজ কল্যাণের আদর্শের সঙ্গে ব্রহ্মবাদের সামঞ্জস্য বিধানের প্রতিফলন দেখা যায়। অধ্যাপক বিশ্বাস মনে করেন রামমোহনের লোকহিতের আদর্শ বেন্থাসের উপযোগিতাবাদের অনুসরণকারী ছিল না, উপনিষদের লোকশ্রেয়সের আশ্রয় দ্বারা প্রভাবিত হয়েই তিনি ধর্মকে সমাজ-কল্যাণের সোপানরূপে নিয়োজিত করতে সচেষ্ট হয়েছিলেন। একই সঙ্গে অন্যান্য ধর্মের প্রতিও তিনি ছিলেন সমানভাবে শ্রদ্ধাশীল।

উপসংহার:

উপরেই উল্লিখিত রামমোহন রায় সম্পর্কে ঐতিহাসিক মহলে মত পার্থক্য পরিলক্ষিত। তবে আধুনিক ভারতের নির্মাতা হিসাবে রামমোহনের দান অবিস্মরণীয়। তিনি যে আধুনিকীকরণের সূচনা করেছিলেন তা সমগ্র উনিশ শতকের নবচেতনার দিক নির্ণয় করেছিল। পরবর্তীতে সেই রেশ বিভিন্ন স্তরে বিভিন্ন ভাবে আজও প্রবাহমান হয়ে চলেছে। একথা অস্বীকার করার উপায় নেই বর্তমান স্থিত সবকিছুই সেই আধুনিকতার বিচ্ছুরণ।

টিপ্পনী

একক ২.৩.২. ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর (১৮২০-১৮৯১ খ্রিষ্টাব্দ)

পটভূমি:

বাংলার মেদনীপুর জেলার অন্তর্গত বীরসিংহ গ্রামে এক দরিদ্র ব্রাহ্মণ পরিবারে ঈশ্বরচন্দ্রের জন্ম হয়। পিতা ঠাকুরদাস বন্দ্যোপাধ্যায় ও মাতা ভগবতী দেবী। দেখা যাচ্ছে তাঁরও জন্ম বাংলার ইতিহাসে এক চরম ক্রান্তিকালেই। সেই সবেমাত্র নবজাগরণের সূচনা ঘটেছে। হয়েছে ইংরেজী শিক্ষার প্রচলন। তাঁর যে দায়িত্বভার এসে পড়ল যথার্থই রাজা রামমোহন রায়ের পর বাংলার সংস্কার আন্দোলনের প্রধানতম দধিচী হয়ে উঠলেন বিদ্যাসাগর। রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদীর ভাষায় ......'' এই দেশে এই জাতির মধ্যে সহসা বিদ্যাসাগরের মত একটা কঠোর কঙ্কালবিশিষ্ট মনুষ্যের কিরূপে উৎপত্তি হইল, তাহা বিষম সমস্যা হইয়া দাঁড়ায়।...তাঁহার বঙ্গদেশে আবির্ভাব একটা অদ্ভূত ঐতিহাসিক ঘটনার মধ্যে গণ্য হইবে সন্দেহ নাই।'' রবীন্দ্রনাথ বলেছেন-''আমাদের এই অবমাণিত দেশে ঈশ্বরচন্দ্রের মতো এমন অখন্ড পৌরুষের আদর্শ কেমন করিয়া জন্মগ্রহণ করিল আমরা বলিতে পারি না। কাকের বাসায় কোকিল ডিম পাড়িয়া যায়- মানব ইতিহাসের বিধাতা সেইরূপ গোপনে কৌশলে বঙ্গভূমির প্রতি বিদ্যাসাগরকে মানুষ করিবার ভার দিয়াছিলেন।'' রামমোহন রায়ের সঙ্গে তাঁর বহু বিষয়ে অমিল থাকলেও ইংরেজী ভাষা বা পাশ্চাত্য শিক্ষার প্রয়োজনীয়তা সম্পর্কে উভয়ের যথেষ্ট আগ্রহ লক্ষ্য করা যায়।

সমাজ সংস্কার:

বিদ্যাসাগরের জীবনের শ্রেষ্ঠ কীর্তি হল বিধবা বিবাহ প্রচলন। রামমোহন যেমন বিভিন্ন শাস্ত্র ঘেঁটে সতীদাহ প্রথা ধর্মসম্মত নয় বলে প্রমাণ করার জন্য উঠে পড়ে লেগেছিলেন, বিদ্যাসাগরও তেমনি বিধবাবিবাহ শাস্ত্রসম্মত প্রমাণ করার জন্য সচেষ্ট হন। 'পরাশর সংহিতা'; 'অগ্নিপুরান' ও অন্যান্য পুরাণে বিধবাবিবাহ শাস্ত্রসম্মত তা তিনি দেখিয়েছিলেন। বিধবাবিবাহের পক্ষে জনমত সৃষ্টি করার জন্য বিদ্যাসাগর ১৮৫৫ সালের জানুয়ারী মাসে বিধবাবিবাহ প্রচলিত হওয়া উচিত কিনা এবিষয়ে পুস্তিকা প্রকাশ করেন। এই সময় সংগঠনিকভাবে এর যেমন বিরোধিতা করা হয় তেমনি বিরোধীতায় পুস্তিকাও প্রকাশিত হয়। প্রেক্ষাপট এমনই ঘোরতর জটিল হয়ে ওঠে বিদ্যাসাগরের আইনের আশ্রয় না নেওয়া ছাড়া আর উপায় থাকল না। তাই ১৮৫৫ সালের ৪ঠা অক্টোবর তিনি প্রায় ১০০০ জন ব্যক্তির স্বাক্ষর সংগ্রহ করে সরকারের কাছে একটি আবেদনপত্র পাঠালেন। বিপক্ষেও, বহু মানুষ স্বাক্ষর প্রদান করেন। কিন্তু তাতে কোন কাজ হল না। ১৮৫৬ সালের ২৬ জুলাই পঞ্চদশতম আইন জারী করে বিধবাবিবাহ আইনসঙ্গত বলে ঘোষণা করা হয়। বিধবাবিবাহ আন্দোলন বাংলাদেশের মধ্যেই সীমাবদ্ধ ছিল না। বাংলার বাইরেও ভারতের বিভিন্ন স্থানে এই আন্দোলনের প্রভাব ছড়িয়ে পড়েছিল। আর একটিতে তাঁর আন্তরিক প্রয়াস লক্ষ্যনীয়-বহু বিবাহের বিরুদ্ধে আন্দোলন। এক্ষেত্রেও, পুস্তিকার মধ্য দিয়ে তিনি জনগণকে বোঝাতে চাইলেন যে, কুলীন প্রথা বা বহু বিবাহের পিছনে শাস্ত্রের কোন সমর্থন নেই। অবশ্য পুস্তিকা রচনার আগেই বিদ্যাসাগর বহু বিবাহের বিরুদ্ধে আন্দোলন

শুরু করেছিলেন। ১৮৫৫ সালের ডিসেম্বর মাসে তিনি বহু বিবাহ রদ করার জন্য সরকারের কাছে একটি আবেদনপত্র পাঠান।এতে প্রায় ২৫,০০০ জন ব্যক্তির স্বাক্ষর ছিল।তাঁর আন্তরিক প্রচেষ্টা ও শিক্ষা বিস্তারের সঙ্গে সঙ্গে কলকাতা ও তৎসন্নিহিত অঞ্চলে বহু বিবাহের প্রকোপ অনেকটাই হ্রাস পায়।

ধর্মসংস্কার:

বিদ্যাসাগর যে মূহূর্তে জন্মেছিলেন ধর্মীয় ক্ষেত্রে যে সময়টিও ছিল সংকটাপন্ন।একদিকে হিন্দুধর্মের রক্ষণশীলতা কাটানো অপরদিকে মিশনারীদের হাত থেকে হিন্দুধর্মকে রক্ষা করা ছিল তাঁর গুরুদায়িত্ব।একথা মনে রাখা দরকার হিন্দুধর্ম ও সমাজের কু-প্রথা ও কুসংস্কার দূর করতে না পারলে হিন্দু ধর্মের পক্ষে খ্রীষ্টান মিশনারীদের আক্রমণ ঠেকানো সম্ভব ছিল না। কারণ এই সময় খ্রীষ্টান মিশনারীরাই নয়, ডিরোজিও অনুগামী ইয়ং বেঙ্গলের সদস্যগণও হিন্দুধর্মের অস্তিত্ব বিলোপ করতে চেয়েছিল। এজন্য রামমোহনের মত তিনিও গোড়া ও রক্ষণশীল হিন্দুদের বিরাগভাজন হয়েছিলেন এবং বিধবা বিবাহ আন্দোলনের জন্য তাঁর জীবন সংশয়ও হয়েছিল।

শিক্ষা ও সমাজ ভাবনা:

সমাজ সংস্কারের:কাজে বিদ্যাসাগর যতটা সাহসিকতার পরিচয় দিয়েছিলেন, তার চেয়ে কোন অংশে কম সাহসিকতা ও নির্ভীকতার পরিচয় দেন নি শিক্ষা বিস্তারের মহৎ ব্রতে। ইউরোপীয় ভাবাদর্শ ও চিন্তা বিদ্যাসাগরকে গভীর ভাবে প্রভাবিত না করলেও ইংরেজী ভাষা ও পাশ্চাত্য শিক্ষার প্রয়োজনীয়তা সম্পর্কে তিনি সব সময়েই সচেতন ছিলেন। বিনয় ঘোষের লেখা থেকে জানা যায় '' শিক্ষায়তনকে তিনি মানবধর্মের নাসারি করে তুলতে চেয়েছিলেন, সেকালের চতুস্পাঠী, আশ্রম বা সাম্প্রতিক কালের ডিগ্রী উৎপাদনের কারখানা করতে চাননি।'' মাতৃভাষার মাধ্যমেই তিনি এই শিক্ষার আদর্শকে জাতি ধর্ম নির্বিশেষে সকলের মধ্যে ছড়িয়ে দিতে চেয়েছিলেন। এইজন্য তিনি ৩৫টি বালিকা বিদ্যালয় ও ২০ টি মডেল স্কুল স্থাপন করেছিলেন।এছাড়া, বিভিন্ন স্কুল স্থাপনে তাঁর অকৃত্রিম সহযোগিতা ছিল চোখে পড়ার মতো। দৃষ্টান্ত হিসাবে হ্যাডিং এর স্কুল স্থাপনে বিদ্যাসাগরের সহযোগীতা তুলে ধরা যেতে পারে। শুধু শহরে নয়, গ্রামেও স্ত্রী শিক্ষা বিস্তারে তাঁর উদ্যোগী ভূমিকা লক্ষ্য করা যায়।আসলে তাঁর কাছে শিক্ষার উদ্দেশ্য ছিল চরিত্রবান মানুষ গড়া। তিনি কাজে বিশ্বাসী ছিলেন, পরিকল্পনায় নয়। তাছাড়া, উচ্চ শিক্ষার জন্যও তৈরী করেন মেট্রোপলিটান ইন্সটিটিউশন যার বর্তমান নাম বিদ্যাসাগর কলেজ।

উপসংহার:

সমকালীন যুগে বিদ্যাসাগর খুব একটা বিতর্কের জায়গায় না থাকলেও তাঁর কাজের অবদান সম্পর্কে পন্ডিতদের মধ্যে যথেষ্ট মতপার্থক্য আছে। কেউ কেউ বলতে চেয়েছেন বিদ্যাসাগর বাঙালী মধ্যবিত্ত সম্প্রদায়ের প্রতিভূ এবং উপনিবেশিক যুগের সীমাবদ্ধতা অতিক্রম করতে পারেননি। কিন্তু একথা স্বীকার্য্য তাঁর মধ্যে ভারতের সনাতন ও শাশ্বত আদর্শের সঙ্গে আধুনিকতার এক অপূর্ব সমন্বয় দেখা গিয়েছিল। ড: অমলেশ ত্রিপাঠী বিদ্যাসাগরকে ''traditional Modernizen'' বলে অভিহিত করেছেন। স্বয়ং রবীন্দ্রনাথ লিখেছেন-'' তাঁর (বিদ্যাসাগর) দেশের লোক যে যুগে বদ্ধ হ'য়ে আছেন, বিদ্যাসাগর সেই যুগকে ছাড়িয়ে জন্মগ্রহণ করেছিলেন। অর্থাৎ সেই বড় যুগে তাঁর জন্ম, যার মধ্যে আধুনিককালেরও স্থান আছে, যা ভাবীকালকে প্রত্যাখ্যান করে না 'যে গঙ্গা মরে গেছে তার মধ্যে স্রোত নেই, কিন্তু ডোবা আছে। বহমান গঙ্গা তার থেকে সরে এসেছে, সমুদ্রের সঙ্গে তার যোগ' এই গঙ্গাকে বলি আধুনিক।

টিপ্পনী

বহমান গঙ্গার সঙ্গেই বিদ্যাসাগরের জীবন ধারার মিল ছিল, এই জন্য বিদ্যাসাগর ছিলেন আধুনিক। যারা অতীতের বড় বাধা লঙ্ঘন করে দেশের চিত্তকে ভবিষ্যতের পরম সার্থকতার দিকে বহন করে নিয়ে যাবার সারথি স্বরূপ, বিদ্যাসাগর মহাশয় সেই মহারথিগণের একজন অগ্রগণ্য ছিলেন, আমার মনে এই সত্যিটিই সবচেয়ে বড় হয়ে লেগেছে।'' সুতরাং এর বাইরে আর কিছু বলার থাকে বলে মনে হয় না; এটিই তাঁর প্রতি সবচেয়ে বড় শ্রদ্ধাঞ্জলি।

২.৩.৩. দয়ানন্দ সরস্বতী (১৮২৪-১৮৮৩ খ্রিষ্টাব্দ)

টিপ্পনী

সূচনা:

দয়ানন্দের পাশে যে বিশেষণটি সবচেয়ে বেশি চিন্তে বা জানতে তাঁকে সাহায্য করে তা হল আর্য সমাজ। তাঁর জন্ম হয়েছিল কাথিয়াওয়াড়ের এক রক্ষণশীল ব্রাহ্মণ পরিবারে। দেশীয় শিক্ষা সম্পর্কে দয়ানন্দের অগাধ পাণ্ডিত্য থাকলেও ইংরেজী ভাষা ও পাশ্চাত্য শিক্ষা সম্পর্কে তিনি ছিলেন একেবারেই অজ্ঞ। কিন্তু তা বলে আধুনিকতার সঙ্গে সম্পর্কিত সবকিছুকে তিনি গ্রহণ করতে পারেননি এমন নয়। বরং আধুনিক মনস্ক এই মানুষটি সবকিছুকেই উদার দৃষ্টিতে অকুণ্ঠ সমর্থন জানিয়েছিলেন। এখানেই অন্যান্যদের সঙ্গে দয়ানন্দের পার্থক্য। তিনিই একমাত্র পাশ্চাত্য শিক্ষা গ্রহণ না করে অত্যন্ত সঠিকভাবেই আধুনিক হয়ে উঠেছিলেন।

মতাদর্শ ও তার প্রাতিষ্ঠানিকতা :

অতি অল্প বয়স থেকেই তিনি পৌত্তলিকতার বিরোধী ছিলেন। জাতিভেদ প্রথাও তিনি মানতেন না। সমুদ্র যাত্রা উদার দৃষ্টিভঙ্গীর এই মানুষটি যেমন ছিলেন বাল্য বিবাহের বিরোধী তেমনি না ছিল অসবর্ণ বিবাহে আপত্তি। বিধবা বিবাহকেও তিনি সমর্থন করেছেন। তিনি সন্ন্যাস ব্রত পালন করে সারা ভারতবর্ষ পরিভ্রমণের মধ্য দিয়ে তর্কযুদ্ধে জয়ী হয়ে জনগনের দরবারে হাজির হয়েছিলেন। ১৮৭৫ খ্রিষ্টাব্দে বোম্বাই শহরে তিনি আর্য সমাজ প্রতিষ্ঠা করলেন। জীবনের বাকি দিনগুলিতে নিজের বাণী প্রচারের সঙ্গে সঙ্গে আর্য সমাজের শাখাও প্রতিষ্ঠা করলেন। দয়ানন্দের চিন্তাধারার আকর গ্রন্থ 'সত্যার্থ প্রকাশ' থেকে জানা যায় তাঁর আদর্শ ছিল বেদভিত্তিক সমাজ গঠন। তাঁর বাণী ছিল বৈদিক ধর্মে প্রত্যাবর্তন। তাঁর দৃষ্টিতে পৃথিবীর যাবতীয় ধর্মীয়, এমনকী বৈজ্ঞানিক তত্ত্বও সত্য বেদের মধ্যে নিহিত আছে। তথাপি, ইউরোপের কাছে ভারতের শেখার কিছু নেই। বৈদিক ধর্মের ন্যায় বৈদিক সমাজকেও তিনি উচ্চাসনে স্থলাভিষিক্ত করেছেন।

সমাজ সংস্কার ও গঠনমূলক কাজ:

দয়ানন্দ সমাদ সংস্কারক ও গঠনমূলক কাজের গুরুত্ব সম্পর্কে অত্যন্ত সচেতন ছিলেন। তিনি মার্টিন লুথারের ন্যায় মনে করতেন ঈশ্বর ও ভক্তের মধ্যে সংযোগ স্থাপনের জন্য পুরোহিতের প্রয়োজন নেই। আর্য সমাজের সব সদস্যই ধর্মীয় আচরণ বিধিতে আবদ্ধ থাকবে এমন চিন্তাধারা তাঁর ছিল না। তিনি চেয়েছিলেন একই সঙ্গে তারা সমাজে গঠনমূলক নৈতিক ও জনহিতকর কাজকর্ম করবে এবং সকলকেই উদ্বুদ্ধ করবে। সমাজে যাদের জায়গা নেই তাদের যেমন জায়গার ব্যবস্থা করলেন তেমনি দয়ানন্দের আর্যসমাজ প্রাকৃতিক বিপর্যয়ে মানুষের পাশে থেকে অকুণ্ঠ সমযোগীতা করলেন। একই সঙ্গে দেশের মানুষ যাতে নিজ দেশের সত্যতা ও ঐতিহ্য সম্পর্কে শ্রদ্ধাশীল হয় শিক্ষার মহৎ আদর্শকে মস্তকে রূপদান করলেন। উচ্চ বিদ্যালয়ের সঙ্গে উচ্চ শিক্ষার সমাহার ঘটিয়ে আধুনিক শিক্ষার নির্যাসকে তিনি সর্বস্তরের কাছে পৌছে দিতে চেয়েছিলেন। এখানে জাতি-বর্ণ-নির্বিশেষে অস্পৃশ্য ও অনুন্নতর উন্নতির প্রয়াস তাঁর ব্রত হয়ে দাঁড়িয়েছিল।

তবে একথা সত্য, অন্যান্য ধর্ম সম্পর্কে তাঁর বিশেষ অধীর আগ্রহ ছিল না। বা অন্য কোন ধর্ম তাকে বিশেষভাবে অনুপ্রাণিত করেনি। এখানেই তাঁর নিজস্বতা-যা কিনা অন্যান্য মহাপুরুষদের থেকে পৃথক করে তুলেছে।

উপসংহার:

পাশ্চাত্য পন্ডিত ফার্কুহার (J.N.Farquhar) প্রশ্ন তুলেছেন দয়ানন্দ নিজের ব্যাখ্যা নিজেই পুরোপুরি বিশ্বাস করতেন কিনা? তবে একথা অস্বীকার করার উপায় নেই যে, তৎকালীন মোট জনসংখ্যার নিরীখে আর্যসমাজের সদস্য সংখ্যা খুব বেশি না হলেও এই আন্দোলন ভারতের জনজীবনকে গভীরভাবে স্পর্শ করেছিল। বিপিনচন্দ্র পাল শুদ্ধি আন্দোলনের তাৎপর্য ব্যাখ্যা করতে গিয়ে মন্তব্য করেছিলেন-"The movement at leastin those days (i.e. 1880s) seemed to me in fact far more political than religious or spiritual." তিনি শুধু ধর্মীয় বা সামাজিক কুসংস্কারের প্রতিবাদই করেননি তার আমূল পরিবর্তন ঘটিয়ে ছিলেন। সমাজ সংস্কার ও পারস্পরিক কলহ বিদ্বেষের অবসানে ঔপনিবেশিক শাসকের বিরুদ্ধে অর্জনও করেছিলেন। তিনি দেখিয়েছেন স্বাধীনতার জন্য কীভাবে কলুষতা দূর করে দেশপ্রেমে উদ্বুদ্ধ হয়ে ঝাপিয়ে পড়তে হয়। আবার হিন্দুধর্ম রক্ষাত্রে তাঁর যুক্তি ছিল ইসলাম বা খ্রীটানের ন্যায় হিন্দুদেরও উচিত একটি নিজস্ব ধর্মগ্রন্থ (বেদ) সামনে রেখে এগিয়ে চলা। আর সমস্ত কিছুর মূলে ছিল সাধারণের বোধগম্য ভাষা যার মাধ্যমে সকলে একাত্ম হতে পারবে। তিনি এই সমস্ত কিছুর মধ্য দিয়ে প্রগতির পথে এগিয়ে যেতে চেয়েছিলেন-নয় পুরোপুরি প্রাচীন পন্থী বা না ছিল পরিবর্তন বিমুখ মনোভাব।

২.৩.৪. জ্যোতিবা ফুলে (১৮২৭-১৮৯০ খ্রিষ্টাব্দ)

সুচনা:

মহারাষ্ট্রের সমাজ সংস্কার আন্দোলনের এক উজ্জ্বল নক্ষত্র ছিলেন জ্যোতিবা ফুলে। অতি সাধারণ কুনবি কৃষক পরিবারে তিনি জন্মগ্রহণ করেছিলেন। ইংরেজী স্কুলে শিক্ষা শেষ করে পিতার ব্যবসায়ে নিজেকে যুক্ত না করে দরিদ্র ও অস্পৃশ্য দের সেবায় তিনি আত্মনিয়োগ করলেন। জীবনের অভিজ্ঞতায় তাঁর উপলব্ধি ছিল দরিদ্র মানুষের সমাজে কোন মর্যাদা নেই, যুগ যুগ ধরে তারা অবহেলিত। এজন্য তিনি যথার্থ শিক্ষার অভাবকেই দায়ী করেছিলেন। এরূপ প্রেক্ষাপটে ব্রাহ্মণদের প্রাধান্যকে প্রতিহত করতে এবং সমাজে শূদ্রের মানবিক মর্যাদা প্রতিষ্ঠা করতে শুরু করেছিলেন সমাজ সংস্কারের কাজ। ১৮৪২ এ একটি বালিকা বিদ্যালয় স্থাপনের মধ্য দিয়ে শুরু হয়ে যায় তাঁর প্রচেষ্টার প্রাতিষ্ঠানিক কাজ। বিধবা বিবাহের ব্যাপারেও তিনি মহারাষ্ট্রে প্রবল আন্দোলন সংগঠিত করেন। সর্বপরি দলিত মানুষদের একত্রিত হয়ে লড়াই করার জন্য ১৮৭৩ খ্রিষ্টাব্দে প্রতিষ্ঠা করলেন 'সত্যশোধক সমাজ'।

স্কুলজীবন থেকেই প্রতিবাদী

মূলত স্কটিশ স্কুলে শিক্ষালাভ করার মধ্য দিয়েই ফুলে সমাজ সম্পর্কে অত্যন্ত সচেতন হয়ে উঠেছিলেন। তাঁর বই 'গুলামগিরি' ব্রাহ্মণ্যবাদের বিরুদ্ধে প্রত্যক্ষ জেহাদ ঘোষণা করেছিল। ১৮৭০ এর দিকে ফুলে 'ব্রহ্মানাচেকসাব' (পুরোহিততন্ত্রের স্বরূপ উন্মোচন) এবং 'শ্বেত কার্যট অনুদ'(কৃষকদের চাবুক) নামে দুটি গ্রন্থ রচনা করে শূদ্রদের সম্মান জানান। ফুলের মতে, হিন্দুদের ইতিহাস শূদ্রের ওপর ব্রাহ্মণদের অত্যাচারের ইতিহাস। ব্রাহ্মণদের সামাজিক আধিপত্যের বিরুদ্ধে এবং নিম্নবর্ণের মানুষের সামাজিক মর্যাদা প্রতিষ্ঠায় তিনি ও তার পত্নী সাবিত্রীবাঈ জনমত

টিপ্পনী

সংগঠিত করলেন। প্রয়োজনে তিনি ব্রিটিশের সাহায্য নিতেও পিছপা হননি। তিনি আন্তরিকভাবেই শূদ্রদের মধ্যে ইংরেজী শিক্ষার বিস্তার ঘটাতে চেয়েছিলেন।

সত্যশোধক সমাজ ও অতীত মহারাষ্ট্র:

টিপ্পনী

সত্যশোধক সমাজের অন্যতম উদ্দেশ্য ছিল ব্রাহ্মণদের রচিত শাস্ত্রীয় বিধানের হাত থেকে অবহেলিত ও অস্পৃশ্য মানুষদের মুক্ত করা এবং মানবাধিকার সম্পর্কে সচেতন করে তোলা। একদিকে তিনি ছিলেন বিধবা-বিবাহের সমর্থক অন্যদিকে ছিলেন সতীদাহ ও বাল্য বিবাহের বিরোধী। লোকহিতবাদী পত্রিকার বিভিন্ন বিবরণ তুলে ধরে ফুলের জীবনীকার কীয়ের দাবি করেছেন যে, পেশোয়ারদের অত্যাচারের হাত থেকে মহারাষ্ট্র মুক্তি পেলেও ব্রাহ্মণদের হাতে এবং উচ্চ সম্প্রদায়ের বুদ্ধিজীবিদের হাতে মানুষের শোষণ চলেছিল। একজন গণতন্ত্রী মানুষ হয়ে তিনি শুধু নীচু জাতের জন্য লড়াই করেননি, মুসলিম ও খ্রিষ্টানদের জন্যও সমমর্যাদার এবং সমান সুযোগের দাবি জানিয়েছিলেন। তাঁর নেতৃত্বে 'সত্যশোধক সমাজ' মানুষের উন্নতির জন্য একটি সামাজিক আন্দোলনের সূচনা করে। এই আন্দোলন ধীরে ধীরে মহারাষ্ট্রের বিভিন্ন এলাকায় ছড়িয়ে পড়ে। ব্রাহ্মণবাদকে তাঁর আক্রমণের পিছনে গভীর সামাজিক কারণও লক্ষ্য করা যায়। তৎকালীন মারাঠা সমাজে ভূস্বামী প্রথা, মহাজনী প্রথা ও পেশোয়া অত্যাচারের অন্যতম প্রতীক ছিল এই ব্রাহ্মণ সম্প্রদায়। আত্মমর্যাদার আদর্শে উদ্বুদ্ধ করে ফুলে মানুষকে অন্যায়ের বিরুদ্ধে লড়াই করার অসীম সাহস জুগিয়েছিলেন। একইসঙ্গে নেতৃত্বও দিয়েছিলেন একেবারে সামনে থেকে। একথা স্মরণে রাখা দরকার উনবিংশ শতকের বেশিরভাগ সমাজসংস্কার আন্দোলন ছিল একেবারেই শহরকেন্দ্রিক। কিন্তু ফুলের প্রতিষ্ঠিত 'সত্যশোধক আন্দোলন' ছিল মূলত গ্রামাঞ্চল ভিত্তিক। তাঁর মৃত্যুর পর আন্দোলন থেমে ছিল না। ব্রাহ্মণরাও পাটিলের সক্রিয় নেতৃত্বে এই অন্দোলন দ্রুত গতিতে এগেয়ে চলেছিল। ক্রমে ক্রমে বর্ণপ্রথার গন্ডী ছিন্ন করে সত্যশোধক সমাজ নির্যাতনের বিরুদ্ধে যে প্রতিবাদ জানিয়েছিল তা ক্রমে অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক সংগ্রামে পরিণত হয়ে ওঠে। জাতীয় আন্দোলনে সত্যশোধন কর্মীদের ভূমিকা কৃতজ্ঞতার চিত্তেও স্মরণ করতে হয়।

উপসংহার:

পৃথিবীর ইতিহাসে মানুষে-মানুষের বিভেদ আজও মানুষকে স্পর্শকাতর করে তোলে। কেবলমাত্র জন্মগত কারণে তার সমস্তকিছুই যদি হরণ হয়ে যায় সে জন্ম তো শুধু জন্ম নয় অভিশাপস্বরূপ। কিন্তু তা তো সঠিক নয়; তা আজ সকলেই স্বীকার করেন। প্রদীপের আলোর বিচ্ছুরণ সেই প্রদীপের তলাতেই পৌছতে পারে না; প্রদীপ সরিয়ে দেখতে হয়। আমাদের আলোকোজ্জ্বল দেশটির অতীতও ছিল সেরূপ একেবারেই আলোছায়া এবং এক পেশে তাকে যারা আলোকিত করেছেন ফুলেও তাদের মধ্যে একজন। ফুলের জীবনীকার শ্রী ধনঞ্জয় কীয়ের তাঁকে মহারাষ্ট্রের 'সমাজ বিপ্লবের পিতা' আখ্যায় ভূষিত করেছেন। সত্যব্রত চক্রবর্তীর (সম্পাদিত) ভারতবর্ষ ঃ রাষ্ট্রভাবনা থেকে উদ্ধৃতি টেনে বলা যায় তিনিই প্রথম 'শূদ্র' যিনি ভারত ইতিহাসে এক নতুন অধ্যায়ের সূচনা করেন। তাই তার প্রতিষ্ঠিত 'সত্যশোধক সমাজ' ছিল সেই সমাজ যেখানে সমতার মধ্য দিয়ে মানুষের স্বাধীকার রক্ষার বীজ অঙ্কুরিত করতো। জাতি-ধর্ম-বর্ণ নির্বিশেষে সকল মানুষই ছিল তাঁদের কাছে এক ও অভিন্ন।

২.৩.৫. বি.আর. আম্বেদকর (১৮৯১–১৯৫৬ খ্রিষ্টাব্দ)

সূচনা:

১৮৯১ খ্রিষ্টাব্দে মধ্যপ্রদেশে একটি দরিদ্র সামাজিকভাবে অস্পৃশ্য পরিবারে (মাহার) ভীমরাও রামজি আম্বেদকরের জন্ম হয়। তিনি বাবাসাহেব আম্বেদকর নামেই অধিক পরিচিত। তিনি ছিলেন পিতামাতার চতুর্দশ সন্তান এবং সর্বকনিষ্ঠ পুত্র। শিশুকাল থেকেই মূলত জন্মগত কারণে তাঁকে হতে হয় উচ্চবর্ণের পক্ষপাত ও বঞ্চনার শিকার। একইভাবে ব্রিটিশ ইষ্ট-ইন্ডিয়া কোম্পানীর অধীন কর্মনিযুক্তির মধ্য দিয়ে তাঁর শোষণ-শাসনের মর্মস্পর্শী দিকটিও উন্মোচিত হয়। মূলত তাঁর জীবন সংগ্রাম ছিল বৃহত্তর সমাজের স্বার্থে, দেশের সেবায় এবং মানুষের কল্যাণে নিয়োজিত।

টিপ্পনী

লেখনীর মধ্যে প্রতিবাদ ও বৌদ্ধধর্মের প্রভাব:

ইংল্যান্ড থেকে দেশে ফিরে দেখলেন কোন কিছুরই পরিবর্তন ঘটেনি। একটা সময়ের পর তাঁর মনে হয় যে হিন্দুধর্মের গন্ডির মধ্য থেকে নির্যাতিত মানুষের মুক্তির কোন সুযোগ নেই। এই বিশ্বাসের জোরে আম্বেদকর উচ্চবর্ণের বিরোধিতা করে নিজেকে হিন্দুধর্ম থেকে সম্পূর্ণ বিচ্ছিন্ন করেন। একথা মনে রাখা দরকার তাঁর উপস্থাপন করা গবেষণা সন্দর্ভটি ছিল " Ancient India Commerce" এবং তাঁর পড়া প্রবন্ধটির শিরোনাম ছিল "The casts in India, their Meehanism, Genesis and Development", পি.এইচ. ডি. সন্দর্ভটির শিরোনাম ছিল "National Dividend for India: A Historic and Analytical Study." পরে এটি তিনি বই আকারে প্রকাশ করেন "The Evolution of Provincial Finance in British India." এই সমস্ত লেখার মধ্য দিয়েই তাঁর পরিণত ভাবনা চিন্তার প্রাতিষ্ঠানিকতা লাভ। তাঁর মন:স্তত্ত্ব রচনায় বিশেষত হিন্দুধর্মের কলুষতা মুক্তই বৌদ্ধধর্মের প্রভাব সুস্পষ্ট লক্ষ্য করা যায়। কারণ বৌদ্ধধর্মই বাতিল করেছিল হিন্দুধর্মের বর্ণ ব্যবস্থাকে। এছাড়া মানুষের সাম্যের দর্শনচিন্তা বুদ্ধ, কবির, জ্যোতিবা ফুলের দ্বারাও তিনি গভীরভাবে প্রভাবিত হন।

দ্বৈতভূমিকা:

লক্ষ্যে স্থির থেকেও পন্থা নির্বাচনে তাঁর চঞ্চলতা ছিল ঠিকই কিন্তু নিষ্ঠার বিন্দুমাত্র অভাব ছিল না। এক্ষেত্রে তাঁর দৈত ভূমিকাই যথার্থভাবে উঠে এসেছে। একদিকে দলিত আন্দোলনের ক্ষেত্রে; অপরদিকে ঔপনিবেশবাদ বিরোধী আন্দোলনে। তিনি উপলব্ধি করেছিলেন বর্ণব্যবস্থার বিরোধিতা করলে উচ্চবর্ণের ভারতীয় জাতীয়তাবাদীদের সমর্থন হারাবেন। অন্যদিকে জাতীয়তাবাদী আন্দোলনকে সফল করার জন্য প্রয়োজন ছিল জাতি-ধর্ম-বর্ণের সংকীর্ণ গন্ডি অতিক্রম করা। এই নিয়ে আম্বেদকরের মনে দ্বিধা ও দ্বন্দ্বের সমাবেশ ঘটেছিল। এক্ষেত্রে দ্বৈতক্ষেত্রেই তাঁর সফলতা উঠে এসেছে। ১৯২৪ খ্রিষ্টাব্দে তাঁর নেতৃত্বে বোম্বাই শহরে গঠিত হয় 'বহিস্কৃত হিতকারিণী সভা'। অনুন্নত সম্প্রদায়ের শিক্ষা ও অর্থনৈতিক উন্নতি বিধানে এই সভার কাজ ছিল চোখে পড়ার মতো। পানীয় জল ব্যবহারকে কেন্দ্র করে আম্বেদকরের নেতৃত্বে পরিচালিত হয় 'মাহার সত্যাগ্রহ' যা জাতীয় আন্দোলনের ইতিহাসে গভীর ছাপ ফেলেছিল। লন্ডন গোলটেবিলে অস্পৃস্যসম্প্রদায়ের প্রতিনিধি এবং প্রয়োজনে পৃথক নির্বাচনের দাবি তোলা হয়। বোম্বাই আইন সভাতেও খেতমজুরের স্বার্থের দিকটিও বিবেচনার বিল উত্থাপিত করা হয়। বোম্বাই পুরসভা শ্রমিকদের জন্য গড়ে তোলেন একটি ইউনিয়ন। বিভিন্ন দলিত গোষ্ঠীর সমন্বয়ে সাংগঠনিক রূপ দেওয়ার জন্য ১৯৪২ খ্রিষ্টাব্দে গঠন করেন 'Scheduled caste Fedaration'। আম্বেদকরের প্রাতিষ্ঠানিক দৃষ্টিভঙ্গি ১৯৩৫ হিন্দুধর্মের বিপক্ষের মধ্য দিয়েই ১৯৩৭ আইনি

জয়লাভ সুনিশ্চিত হয়। ১৯৪৬ সংবিধানের প্রস্তাবনায় অভিভাষণে তিনি বলেন, জাত-পাতের মধ্যে ভারত বহুধা বিভক্ত হলেও, ভারত যথা সময়ে ঐক্যবদ্ধ হবে। তাছাড়া, ...সংবিধান প্রস্তুতির সভাপতি রূপেও তার গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা উল্লেখ করা যায়। এই প্রেক্ষাপটে ভারতীয় সংবিধানে ১৭নং ধারায় অনুন্নত শ্রেণীর জন্য বিশেষ সুযোগ-সুবিধার কথা বলা হয়েছে। ১৯৫৫ খ্রিষ্টাব্দে অস্পৃশ্যতা আইনত দন্ডনীয় অপরাধরূপে একটি আইন 'The Untouchability Offence Act 1955'অনুমোদিত হয়।

টিপ্পনী

উপসংহার:

আম্বেদকরের সঙ্গে জাতীয়তাবাদী নেতৃত্বে যেমন গান্ধি বা জওহর লাল নেহেরুর মতপার্থক্য যে ঘটেনি এমনটি নয়। গান্ধির দৃষ্টিতে বর্ণব্যবস্থা ভারতীয় জাতির ভিত্তিপ্রস্তর। গান্ধিজী বিপরীত প্রতিক্রিয়ার কথা মাথায় রেখে এই ব্যবস্থাকে ধ্বংস না করে সংস্কারের ওপর জোর দিয়েছিলেন। কিন্তু আম্বেদকর ছিলেন বর্ণব্যবস্থা বিলোপ সাধনের পক্ষপাতি। অপরদিকে নেহরু যে আধুনিকতার স্বপ্ন দেকেছিলেন তা জাতি-ধর্ম-বর্ণ সমস্ত কিছুর উর্দ্ধে ওঠে। কিন্তু আম্বেদকরের দৃষ্টিতে আধুনিকতার ক্ষেত্রটি ছিল সম্পূর্ণ সংগ্রামের মধ্যে দিয়ে তার পরিণত রূপে পৌঁছানো। মূলত আম্বেদকর যে পরিবেশে বড় হয়ে উঠেছিলেন সেই পরিবেশের গভীরে ঢুকে তার যথাবিহীত ব্যবস্থা করা ছাড়া তার আর কোন বিকল্প ব্যবস্থা রইল না। একদিকে অস্পৃশ্য বিরোধী আন্দোলনকে যেমন সুপ্রতিষ্ঠিত করেছিলেন অন্যদিকে দলিতদের স্বার্থে তাঁর ভাবনাকেও প্রাতিষ্ঠানিক করে তুলেছিলেন। এরজন্য জাতীয় আন্দোলনের গতি মন্থর হয়নি বরং ত্বরান্বিত ঘটেছিল। তিনি সামাজিক সমতা ও অর্থনৈতিক মানদন্ডের নিরীখে জীবনের সংগ্রামেও যথেষ্ট সফলতা পান। এই সমস্ত কিছুর মধ্য দিয়ে জাতীয় আন্দোলনে সর্বস্তরের মানুষের অংশগ্রহণ জাতীয়তাবাদকে আরো স্বচ্ছ সঙ্ঘবদ্ধ ও আদর্শিত করে তুলেছিল। সেটি কেবল ঔপরিক পরিকাঠামো নয়, সর্বস্তরের ভিতরকার আত্মীক বল।

প্রশ্নাবলী

১. রাজা রামমোহন রায় ছিলেন নবযুগের পথিকৃৎ আপনি কীভাবে ব্যাখ্যা করবেন?

২. বিদ্যাসাগরের সমাজ সংস্কার আন্দোলনে ভূমিকা পর্যালোচনা করুন।

৩. সমাজ সংস্কার ও গঠনমূলক কাজে দয়ানন্দ সরস্বতীর অবদান কী কী ছিল?

৪. জ্যোতিবা ফুলের সত্যশোধক সমাজের ওপর একটি প্রবন্ধ লিখুন।

৫. জাত-পাতের বিরুদ্ধে আম্বেদকরের ভূমিকা মূল্যায়ন করুন।

সংক্ষিপ্ত :

১. ভারত পথিক কে ছিলেন?

২. সতীদাহ কী?

৩. কত খ্রিষ্টাব্দে সতীদাহ রদ করা হয়?

৪. বিধবা বিবাহ আইন কবে পাশ হয়?

৫. আর্যসমাজ কে প্রতিষ্ঠা করেন?

৬. ফুলে কে ছিলেন?

৭. গুলামগিরি কার লেখা?

৮. সত্যশোধক সমাজ কে প্রতিষ্ঠা করেন?

৯. The Evolution of Provincial Finance in British India.” বইটি কার লেখা?

১০. কত খ্রিষ্টাব্দে ‘Scheduled caste Fedaration’ গঠিত হয়?

১১. ‘বহি:স্কৃত হিতকারিণী’ সভা কোন শহরে গড়ে উঠেছিল?

গ্রন্থপঞ্জী

১. শেখর বন্দ্যোপাধ্যায়, পলাশি থেকে পার্টিশন

২. সুমিত সরকার, আধুনিক ভারত

৩. বিপিনচন্দ্র ও অন্যান্য, ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রাম

৪. সত্যব্রত চক্রবর্তী, ভারত রাষ্ট্রভাবনা

৫. সমর কুমার মল্লিক, ভারতবর্ষের ইতিহাস (প্রথম খন্ড ও দ্বিতীয় খন্ড)

৬. সূচিব্রত সেন, আধুনিক ভারতের ইতিহাস

৭. অশোক কু. মুখোপাধ্যায়, ভারতীয় রাষ্ট্রচিন্তা পরিচয়।

টিপ্পনী

- আত্মীয় সভা – ১৮১৫ খ্রিস্টাব্দ।
- ব্রাহ্ম সভা – ১৮২৮ খ্রিস্টাব্দ।
- রামমোহন রায় প্রকাশিত সংবাদপত্র – সম্বাদ কৌমুদি ও মিরাৎ-উল-আখবর।
- সতীদাহ প্রথা নিষিদ্ধ – ১৮২৯ খ্রিস্টাব্দ (১৭নং রেগুলেশন আইন)।
- ১৮২৯ খ্রিস্টাব্দে ভারতের গভর্নর জেনারেল – লর্ড উইলিয়াম বেন্টিঙ্ক।
- ‘ভারত পথিক’ – রাজা রামমোহন রায়।
- ‘রামমোহন সমীক্ষা’ গ্রন্থ – অধ্যাপক দিলীপ কুমার বিশ্বাস।
- ‘লিপিমালা’ গ্রন্থ – রামরাম বসু।
- ‘প্রবর্তক ও নিবর্তকের সম্বাদ’ পুস্তক – রামমোহন।
- ‘বর্ণমালা’, ‘কথামালা’, ‘বোধদয়’ গ্রন্থ – বিদ্যাসাগর।
- “Traditional Modernizer” – বিদ্যাসাগর।
- নারায়ন চন্দ্র – বিদ্যাসাগরের পুত্র।
- বিদ্যাসাগরের সামাজিক সংস্কার আন্দোলন – বহু বিবাহ, বাল্য বিবাহ নিবর্তন এবং বিধবা বিবাহ প্রবর্তন।
- বিধবা বিবাহ আইন প্রণীত – ১৮৫৬ খ্রিস্টাব্দ (১৫ নং আইন)।

টিপ্পনী

- 'আমাদের এই অপমানিত দেশে ঈশ্বরচন্দ্রের মতো এমন অখন্ড পৌরুষের আদর্শ কেমন করিয়া জন্মগ্রহণ করিল, আমরা বলিতে পারি না। .... দয়া নহে, বিদ্যা নহে, ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের চরিত্রে প্রধান গৌরব তাঁহার অজেয় পৌরুষ, তাঁহার অক্ষয় মনুষ্যত্ব।' – রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর।
- 'শুদ্ধি' অহিন্দুকে হিন্দুধর্মে ধর্মান্তরিতকরণ।
- দয়ানন্দের প্রতিষ্ঠিত ধর্মান্দোলনের মূল ভিত্তি – বেদ।
- দয়ানন্দ পরবর্তী আর্য-সমাজী নেতৃবৃন্দ – লালা হংসরাজ, পন্ডিত গুরুদত্ত, লালা লাজপদ রায়, স্বামী শ্রদ্ধানন্দ প্রমুখ।
- Anglo-vedic ccollege স্থাপন –লালা হংসরাজ (লাহোরে)।
- আর্য সমাজ প্রতিষ্ঠা – ১৮৭৫ খ্রিস্টাব্দ।
- 'সত্যশোধক সমাজ' – ১৮৭৩ খ্রিস্টাব্দ।
- 'মহারাষ্ট্রে বিদ্যাসাগর' – বিষ্ণুশাস্ত্রী পন্ডিত।
- মহারাষ্ট্রের সমাজ বিপ্লবের পিতা – জ্যোতিরাও ফুলে (ধনঞ্জন কীয়ের মতে)।
- ফুলের মৃত্যুর পর আন্দোলনে নেতৃত্বদান – মুকুন্দরাও পাটিল।
- বি. আর. আম্বেদকর – ভীমরাও রামজি আম্বেদকর।
- 'বহিস্কৃত হিতকারিনী সভা' – ১৯২৮ খ্রিস্টাব্দ।
- 'বহিস্কৃত ভারত' পত্রিকা – ১৯২৭ খ্রিস্টাব্দ।
- 'যাহার সত্যাগ্রহ' – মহারাষ্ট্রে কোলাবা জেলায় জল ব্যবহারকে কেন্দ্র করে আম্বেদকরের নেতৃত্বে পরিচালিত হয় 'যাহার সত্যাগ্রহ'।
- 'যাহার' – অস্পৃশ্য পরিবার।
- 'পুনা চুক্তি' – আম্বেদকর ও গান্ধিজির মধ্যে স্বাক্ষরিত।
- 'Independent Labour Party'র প্রতিষ্ঠাতা – আম্বেদকর।
- 'Scheduled Caste Federation' গঠন – ১৯৪২ খ্রিস্টাব্দ।
- Annihilation of the Caste গ্রন্থ – আম্বেদকর।
- 'খসড়া সংবিধান' কমিটির সভাপতি – আম্বেদকর।

পর্যায় ২.৪. গান্ধি ও জাতীয়তাবাদী আন্দোলন

- সূচনা
- সত্যাগ্রহ
- দক্ষিণ আফ্রিকায় গান্ধিজি
- তৎকালীন ভারতবর্ষের পরিস্থিতি
- গান্ধিজির ভারতীয় রাজনীতিতে যোগদান
- আঞ্চলিক সত্যাগ্রহ : চম্পারণ, আমেদাবাদ ও খেদা আঞ্চলিক ক্ষেত্রগুলির মূল্যায়ন
- রাওলাট সত্যাগ্রহ ও পাঞ্জাব সন্ত্রাস
- খিলাফৎ আন্দোলন
- অসহযোগ আন্দোলন
- আইন অমান্য আন্দোলন, গোলটেবিল ও গান্ধি-আরউইন চুক্তি

টিপ্পনী

২.৪. <u>গান্ধি ও জাতীয়তাবাদী আন্দোলন</u>

<u>সূচনা</u>ঃ

গান্ধি বললেই চিরাচরিত একটা ছবিই আমাদের কাছে ভেসে আসে-তার বাল্য নয়, যৌবন নয় বার্ধক্যের সেই আটপৌরে একখন্ড খাদি আর বাঁশের লাঠি ধরা খড়ম পায়ে হেঁটে চলা মূর্ত জীবন্ত প্রতীক। কিন্তু একথাও মনে রাখা দরকার বাল্য-যৌবনের শক্তভিত ও তেজস্বি মনোভাব তাঁকে যথার্থ গান্ধিতে পরিণত করেছিল। ১৮৬৯ খ্রিষ্টাব্দের ২ রা অক্টোবর গুজরাটের পোরবন্দরে গান্ধি জন্মগ্রহণ করে মননে যে বীজ রোপিত করেন তা নিয়েই তিনি ১৮৯১ খ্রিষ্টাব্দে ইংল্যান্ড থেকে ব্যারিস্টার পাশ করেন। তাই যৌবনে তাঁর জীবনে শুধু আইন ব্যবসার মধ্যেই সীমাবদ্ধ থাকল না; বিলীন ঘটল বৃহত্তর সমাজ ও রাষ্ট্রের বিভিন্ন আঙিনায়। দেখা গেল ১৮৯২ খ্রিষ্টাব্দে আইন ব্যবসার উদ্দেশ্যে তিনি দক্ষিণ আফ্রিকার নাটালে যাত্রা করলেও সেখানকার সমাজ ও রাষ্ট্রের বিভিন্ন আঙিনায় বিশেষত মানুষের যথার্থ অধিকার রক্ষায় এগিয়ে আসলেন। বলা যেতে পারে এখানেই তাঁর রাজনৈতিক জীবনের সূত্রপাত।

<u>সত্যাগ্রহ</u>ঃ

জন্মগত বা পারিবারিক সূত্রে জৈনধর্ম, বৈষ্ণব প্রভাব, শ্রীমদ্‌ভাগবত গীতা, বাইবেল এছাড়া, এডউইন আর্নল্ড-এর জীবনী (‘Light of Asia’), রাস্‌কিন রচিত ‘শেষ পর্যন্ত’ (Unto the last), টলস্টয়-এর ‘ঈশ্বরের রাজ্য’ (‘Kingdom of God’) এবং থরো ও এমারসন-এর রচনা দ্বারা গান্ধি বিশেষভাবে প্রভাবিত হয়ে ‘সত্যাগ্রহ’ সম্পর্কে ধ্যান-ধারনা গড়ে তোলেন। ‘সত্যাগ্রহ’ কথাটি এসেছে ‘সত্য’ ও ‘আগ্রহ’ অর্থাৎ সত্যের প্রতি আগ্রহ থেকে। সত্যাগ্রহ নীতি ভারতবর্ষের প্রাচীন যুগের ঋষিগণেরও আদর্শ। কিন্তু গান্ধি এই নীতিকে সর্বপ্রথম রাজনীতিতে প্রয়োগ করেন। তাঁর নির্দেশিত সত্যাগ্রহের আমরা দুটি আদর্শগত দিক লক্ষ্য করে থাকি। প্রথমত-সত্যের প্রতি অনুরাগ ও বিশ্বাস। দ্বিতীয়ত- অহিংস উপায়ে সত্যের পথ অনুসরণ।

সত্য ও অহিংসার ওপর প্রতিষ্ঠিত এবং অন্যায়ের বিরুদ্ধে পরিচালিত সংগ্রাংমকে তিনি ‘সত্যাগ্রহ’ বলে আখ্যা দেন। তিনি বলেন–“শত্রুর প্রতি যে মানুষ ঘৃণা বা বিদ্বেষ পোষণ না করে এবং কোনভাবে শত্রুকে আঘাত না করে, সে মানুষ যথার্থই সত্যাগ্রহী। তাঁর মতে সত্যাগ্রহ হল ‘আত্মার শক্তি’ বা ‘প্রেমের শক্তি’। সত্যাগ্রহ সম্পর্কে গান্ধিজি হিন্দ্ স্বরাজ গ্রন্থে লেখেন–“সত্যাগ্রহই সবচেয়ে বড় অস্ত্র। এই আত্মিক বলের তুলনা হয় না। ইহা অস্ত্রবলের চেয়েও বড়ো। ......ভালো ফল পাইতে হইলে পথটাও ভালো হওয়া চাই এবং যদি সব সময়ও না হয়, তবু কোনো কোনো সময় অস্ত্রের বল অপেক্ষা দয়ার বল যে অধিক শক্তিশালী তাহাতে এতটুকুও সন্দেহ নাই। পাশব শক্তি প্রয়োগে হানি ঘটে, দয়ার কখনও ক্ষতি হয় না” (শান্তিকুমার মিত্র (সম্পাদিত) –গান্ধী রচনা সম্ভার (প্রথম খন্ড), কলকাতা, ১৯৭০, পৃ: ৪৯) তাঁর মতে, সত্যাগ্রহী অহিংস অসহযোগ ও আইন অমান্যের দ্বারা শান্তিপূর্ণভাবে অনাচারের প্রতিবাদ করবে–কখনই সে হিংস হয়ে উঠবে না। এর মধ্য দিয়েই তার অন্তরের শুভবুদ্ধির জাগরণ ঘটবে। সে সর্বদাই অন্যায়কে ঘৃণা করবে, কিন্তু অন্যায়কারীকে নয়। তিনি মনে করেন নিস্ক্রিয় ‘প্রতিরোধ’ হল দুর্বলের অস্ত্র, কারণ তাতে হিংসার স্থান আছে, কিন্তু ‘সত্যাগ্রহ’ সবলের অস্ত্র, এতে অত্যাচারীর মঙ্গল কামনা করা যায়। আসলে এ সমস্তকিছু গান্ধিজির রাজনৈতিক দর্শন–যা কিনা হিন্দ্ স্বরাজ বইটিতে বিশেষভাবে প্রতিফলিত হয়েছে। পাশ্চাত্য দার্শনিক টলস্টয় ও রাস্কিনের ভাবনা দ্বারা প্রভাবিত হয়ে গান্ধিজি স্বাধীনতা লাভের জন্য ভারতবাসীকে যে কর্তব্যের নির্দেশ দিয়েছিলেন তা হিন্দ্ স্বরাজ বইটিতে ব্যাখ্যা করা হয়েছে।

টিপ্পনী

<u>দক্ষিণ আফ্রিকায় গান্ধিজি</u> :

গান্ধিজির রাজনৈতিক জীবনের সূত্রপাত ঘটে দক্ষিণ আফ্রিকায়। পিছন ফিরে যদি আমরা ১৮৯৩ খ্রিষ্টাব্দে চলে যাই তাহলে দেখব যে, সেই বছর দক্ষিণ আফ্রিকায় ডারবানে এসে নামলেন এক তরুণ ভারতীয় ব্যারিস্টার। কিন্তু তাঁর মননে যে বীজ রোপিত ছিল দক্ষিণ আফ্রিকার বৈষম্যমূলক সমাজ তথা পরিবেশ তাকে নাড়া দিল। তাঁর যে কর্মকান্ড শুধু ব্যারিস্টারীর মধ্যেই সীমাবদ্ধ রইল না সে কথা আগেই উল্লিখিত তিনি নিয়মনীতি, আইন-কানুন, ন্যায়-অন্যায়, অধিকার-স্বাধীকার সবকিছুই যথাযথ বুঝতেন। এছাড়া, প্রবাসী ভারতীয়দের সঙ্গে নিজ ভাষার বন্ধনে যে সর্বাঙ্গীন আত্মীক ভাগিদার হয়ে ওঠার প্রচেষ্টা তাঁকে সর্বদাই তাড়া দিয়েছিল। বুওরদের (আখচাষিদের ডাচ ভাষায় বলা হত Bore) হয়ে গান্ধি যখন প্রথম লড়তে শুরু করলেন তখন তাকে কম অবজ্ঞা করা হয়নি। কিন্তু গান্ধি থেমে থাকেননি। ডারবান থেকে প্রিটোরিয়া যাবার পথে ট্রেন থেকে নামিয়ে দেবার ঘটনা তাঁর মনটাকে সম্পূর্ণ পালটে দিয়েছিল। এরপরও তাঁর কপালে জুটেছিল অকারণে মারধর, লাথি ঘুসি ও চড় থাপ্পড়। বিনিময়ে গান্ধি অত্যাচারীর প্রতি ভালোবাসার অহিংস মন্ত্র বিলিয়ে বা ছড়িয়ে দিলেন। এই সমস্ত কিছুর মধ্য থেকেই দক্ষিণ আফ্রিকায় গান্ধিজির মনে ধীরে ধীরে জন্ম নেয় তাঁর ‘স্বপ্নের ভারতবর্ষ’।

১৮৯৪ খ্রিস্টাব্দ থেকে ১৯০৬ খ্রিস্টাব্দের মধ্যবর্তী সময় দক্ষিণ আফ্রিকায় ভারতীয়দের জন্য গান্ধিজির সংগ্রাম ছিল তাঁর রাজনৈতিক কর্মজীবনের প্রথম পর্যায়ের অন্যতম অদ্যায়। জাতি-ধর্ম-বর্ণ এবং ধনী-দরিদ্র নির্বিশেষে গান্ধিজি দক্ষিণ আফ্রিকার সকল প্রবাসী ভারতীয়কে ঐক্যবদ্ধ করে সংগ্রামে অবতীর্ণ হন। এই ভারতীয়দের মধ্যে ছিল গুজরাটী, হিন্দু, ডোরা মুসলিম ও পার্শী সম্প্রদায়ের লোক এবং কিছু তামিল। এঁদের মধ্যে ছিল ধনী, ভারতীয় ব্যবসায়ী, ভারতীয় খনি শ্রমিক। তাঁর সত্যাগ্রহ ভাবনার প্রথম প্রয়োগ হয় দক্ষিণ আফ্রিকায়। প্রতিটি ভারতীয়কে রেজিস্ট্রেশন সার্টিফিকেট নেওয়া বাধ্যতামূলক করলে গান্ধিজির নেতৃত্বে দক্ষিণ আফ্রিকায় শুরু হয় নিস্ক্রিয় প্রতিরোধ। জেল ভরো কর্মসূচী বা আন্দোলনে মানুষের মনে জেলের ভয় কেটে যায়। নাটানে ভারতীয় কংগ্রেস প্রতিষ্ঠা এবং Indian Opinion নামে পত্রিকা প্রকাশ বা গণসংগঠনও এই সময় গড়ে ওঠে। এগুলিতেও গান্ধির ভূমিকা ছিল অনস্বিকার্য্য। অপরদিকে

সত্যাগ্রহীদের থাকার বিকল্প ব্যবস্থা টলস্টয় খামার প্রভৃতির মধ্য দিয়ে আন্দোলনকে থেমে থাকতে দেননি। হিন্দু, মুসলমান ও পার্শিদের সামাজিক বিবাহকে অস্বীকার করা হলে ভারতীয়রা নারীজাতির প্রতি অবমাননাকর বলে চিহ্নিত করে এবং পুরুষ ও নারী সকলে প্রতিবাদে মুখর হয়। গান্ধিজির সংগ্রাম নাটাল থেকে ক্যাসেল সর্বত্রই ছড়িয়ে পড়ল। তাঁর বহু দাবি দক্ষিণ আফ্রিকার সরকার মেনে নেয়; কিন্তু কঠিন সময়েও তিনি অভিযোগ বা অহিংসার পথ গ্রহণ করেননি। গান্ধির দৃষ্টিভঙ্গি ছিল সুদূরপ্রসারী, আদর্শে ছিল অবিচল-এইভাবেই তাঁর নেতৃত্ব হয়ে উঠল সর্বভারতীয়।

টিপ্পনী

ভারতীয় রাজনীতিতে অনুপ্রবেশের পূর্বে দক্ষিণ আফ্রিকার ইতিহাসে গান্ধি যেভাবে নিজেকে তুলে ধরলেন তার বহুবিধ তাৎপর্য লক্ষ্য করা যায়।

প্রথমত, সর্বস্তরের মানুষের মেলবন্ধন; যা প্রবাসী ভারতীয়রা ইতিপূর্বে কখনই করে উঠতে পারেনি। এটি যে কেবল দাবি-দাওয়া বা অধিকার আদায়ের ভাবনা এমনটি নয়;বিভিন্ন ধর্ম, ভাষা ও সংস্কৃতিরও মেলবন্ধন ঘটেছিল। গান্ধি সামাজিক বিভাজনের মূলে কুঠারাঘাত করে হিন্দু-মুসলিম ঐক্য ও সম্প্রীতির বাতাবরণ গড়ে তোলেন। এখানেও আত্মীকভাবে উঠে এসেছে, শ্রদ্ধা, সহানুভূতি, আস্থা ও বিশ্বাসের মতো বন্ধনের ঘরোয়া সম্পর্ক।

দ্বিতীয়ত, তাঁর যাবতীয় সংগঠন ও আন্দোলনের অন্যতম প্রধান অবলম্বন ছিল সত্যাগ্রহ পদ্ধতি; যা অত্যাচারীকেও নাড়া দিয়েছিল। সে সেখান থেকে আরো ভালো হবার সুযোগ পেয়েছিল; যেটি তার কাছে কখনই কাঙ্খিত ছিল না। এদিকে সত্যাগ্রহীও ভালো পথে থেকে শত্রুরও মন জয় করে তাঁর লক্ষ্যপূরণ বা জয়লাভে প্রবল আত্মসংযমী ও নৈতিক বলবান হয়ে ওঠার সুযোগ পেয়েছিল।

তৃতীয়ত, দক্ষিণ আফ্রিকার সফলতা গান্ধি কে আন্তর্জাতিক খ্যাতি শুধু এনে দেয়নি; আন্তর্জাতিক স্তরে গান্ধিপন্থা-মতাদর্শে বহু মানুষকে অনুপ্রাণিত করে। একই সঙ্গে সেই প্রভাব ভারতেও অনুভূত হয়। পরবর্তীকালে গান্ধি এই একই নীতিতে পূর্বের অভিজ্ঞতার ভিত্তিতে ভারতীয় মুক্তি সংগ্রামের নেতৃত্বে আবদ্ধ সুপ্রতিষ্ঠিত হয়। এস.আর.মেহরোত্রা-র মতে গান্ধিজি ছিলেন ভারতীয় মুক্তি সংগ্রামে দক্ষিণ আফ্রিকার আন্দোলনের সবচেয়ে বড় উপহার। "The greatest gift of the Indian Struggle in South Africa to the Indian national movement was Gandhi Himself"-Towards Indian's Freedom and partition, S.R.Mehrotra, P-141. দক্ষিণ আফ্রিকায় তিনি নিজেকে তৈরী করেন কিভাবে জনসাধারণকে কাছে টেনে আনতে হয় এবং কিভাবে নিজ পরিকল্পনা অনুযায়ী আন্দোলনের পথে তাদের শৃঙ্খলাবদ্ধভাবে পরিচালিত করতে হয়। ভয়কে জয় করে, অহিংসায় শত্রুকে ভালোবেসে মোহনদাস করমচাঁদ গান্ধি হয়ে উঠলেন নেতা গান্ধি।

তৎকালীন ভারতবর্ষের পরিস্থিতিঃ

ব্রিটিশের ঔপনিবেশ এই ভারতবর্ষ তখন ছিল অর্থনৈতিক রাজনৈতিক বঞ্চনার চরম স্বীকার। রজনী প্লাস দত্তের 'আজিকার ভারত' গ্রন্থ থেকে জানতে পারা যায় দেশটি দরিদ্র ছিল না; দেশের মানুষ দরিদ্র ছিল। এই ব্যাখ্যায় উঠে এসেছে ঔপনিবেশিক শাসকের অর্থনৈতিক বঞ্চনা ও সম্পদের নির্গমন; যা দেশটিকেও সম্পদহীন করে তুলেছিল। জাতীয় কংগ্রেস প্রতিষ্ঠার পর কংগ্রেসের নরমপন্থী নেতারা তারই প্রতিবাদে সোচ্চার হয়েছিলেন;কিন্তু সে কেবলই প্রতিবাদ। আর চরমপন্থীরা ঔপনিবেশিক সরকারের বিরুদ্ধে সেভাবে সক্রিয় আন্দোলন গড়ে তুললেন; তাদেরও পূর্ণ শক্তির অভাব ঘটল ব্রিটিশের সঙ্গে সমানতালে পেরে উঠতে। অভ্যন্তরীণ মতাদর্শের বিষয়টি তাঁদেরকে যেমন পূর্ণশক্তির স্তরে পৌছতে দিল না একইভাবে আন্তর্জাতিক পরিস্থিতিরও

মোকাবিলা করা সহজ হল না। দেখা যাচ্ছে ভারতের ওপর প্রথম বিশ্বযুদ্ধের প্রভাব নানাভাবে পড়েছিল। যুদ্ধে একদিকে ছিল ইংল্যান্ড, ফ্রান্স ও রাশিয়া (মিত্রপক্ষ বা Allied Powers) অন্যদিকে ছিল জার্মানি, অস্ট্রিয়া, তুরস্ক, বুলগেরিয়া (অক্ষশক্তি বা Axis Powers) প্রভৃতি রাষ্ট্র জোট। জার্মানির দ্রুত শিল্পের প্রসার ও সামরিক সম্ভারের প্রস্তুতি ইউরোপে ইংল্যান্ডের রাজনৈতিক ও নৌ-প্রভুত্ব বিপন্ন করে তুলেছিল। স্বভাবতই ইংল্যান্ড সর্বশক্তি দিয়ে তার হৃতগৌরব পুনঃরুদ্ধারে বদ্ধপরিকর হয়ে উঠবে; সেটাই প্রত্যাশিত। আর তার অন্যতম প্রধান উপনিবেশ সহযোগিতা করবে সেটাই কাঙ্ক্ষিত। কিন্তু এটাও ঠিক ভারত তো আর এমনি এমনি সহযোগিতা করবে না; বিনিময়ে কিছু চাওয়া-পাওয়ার বিষয় তো থাকবেই। অধ্যাপক সুমিত সরকারের মতে, প্রথম বিশ্বযুদ্ধ ভারত ও ব্রিটেনের পরস্পর-বিরোধী স্বার্থের প্রশ্নকে তীব্রতর করে তুলেছিল। অপরদিকে, বিশ্বযুদ্ধের সময় দ্রব্যমূল্য অত্যধিক বৃদ্ধি পাওয়ায় ভারতীয়দের জীবন-যাত্রা অচল হয়ে পড়ে। একইসঙ্গে ভারতীয় জনসম্পদকেও ব্রিটিশ সরকার ব্যাপকভাবে ব্যবহার করেছিল। ব্রিটেন তার সেনাদলে অতিরিক্ত ভারতীয় সেনা নিয়োগের নীতি নেয়। ভারতীয় সেনা দলে এক-দুই মিলিয়ন ভারতীয় সেনা নিয়োগ করা হয়। হাজার হাজার ভারতীয় সেনাকে সঙ্কটজনক রণক্ষেত্রে মৃত্যু নিশ্চিত জেনেও পাঠিয়ে দেওয়া হয়। যুদ্ধে, কৃষক, ব্যবসায়ী, মধ্যবিত্ত সকল শ্রেণীর মানুষ ভীষণভাবে ক্ষতিগ্রস্থ হয়। যুদ্ধ শেষেও এই অবস্থা অব্যাহত থাকে। যুদ্ধ শেষে সকল সেনাদের বিনা ক্ষতিপূরণে ছাঁটাই করা হয়। ব্যবসায়ী ও বণিক শ্রেণীর মধ্যেও দেখা দেয় অসন্তোষ। কারণ উভয় শ্রেণী যুদ্ধে লাভবান হয়নি, তাছাড়া যুদ্ধের শেষেও তারা মন্দার সম্মুখীন হয়। জুডিথ ব্রাউন Cambridge History Of India (vol-vi), তে দ্রব্যমূল্য বৃদ্ধির যে আনুমানিক সূচক দিয়েছেন তাতে দেখা যায় যে, ১৯১৩ খ্রি: ১৪৩, ১৯১৬ খ্রি: ১৮৫, ১৯১৮ খ্রি: ২২৫, ১৯২৯ খ্রি: ২৮১ পর্যন্ত মূল্যসূচক বৃদ্ধি পায়। প্রথম বিশ্বযুদ্ধ ও তারপরে 'ভারতে ট্রেড ইউনিয়ন এবং শ্রমিক আন্দোলন' জোরদার হয়। সামগ্রিক পরিস্থিতি তলানিতে গিয়ে ঠেকে অগ্নিগর্ভের সূচনা ঘটায়।

টিপ্পনী

<u>গান্ধিজির ভারতীয় রাজনীতিতে যোগদান</u> :

দক্ষিণ আফ্রিকার বিজয়ের অভিজ্ঞতা নিয়ে উপরোক্ত ভারতীয় পরিস্থিতিতে আগমন ঘটল গান্ধির। নেতা গান্ধি নিয়ে আলোচনার শুরুতেই তাঁকে সঠিকভাবে জেনে নিতে জওহরলাল নেহরুর উক্তি অতীব স্মরণীয়। ভারতীয় রাজনীতিতে গান্ধিজির প্রবেশ সম্পর্কে নেহরুর দৃষ্টিভঙ্গি-" গান্ধিজি এলেন-যেন স্নিগ্ধ নির্মল বায়ুপ্রবাহ, আমরা নিশ্বাস নিয়ে স্বস্তি পেলাম, যেন আলোকের রেখায় অন্ধকার ভেদ করে আমাদের নয়নের আবরণ দূর করে দিল, ঘূর্ণি বায়ু এসে যেন ওলটপালট করে দিল, বিশেষ করে মানুষের মনকে। তিনি উচ্চশিখর থেকে আমাদের মধ্যে নেমে আসেননি, ভারতের অগণিত সাধারণ শ্রেণীর মধ্য থেকেই যেন তিনি বেরিয়ে এলেন, তাদের ভাষাতেই কথা বলেন, আর তাদের দু:খ-দুর্দশার কথাই সর্বদাই আলোচনা করছেন।......ভয়ের যে কৃষ্ণ যবণিকা দেশবাসীকে আচ্ছন্ন করে রেখেছিল তিনি তা দূর করতে মানুষকে অভয়বাণী শোনালেন।" -জওহরলাল নেহরু (অনুবাদ)-ভারত সন্ধানে, কলকাতা, ১৯৯১, পৃ-৩১২-১৩। ভারতে এসেই সঙ্গে সঙ্গে তিনি রাজনৈতিক রঙ্গমঞ্চে অনুপ্রবেশ করেননি। গোপালকৃষ্ণ গোখলের পরামর্শে তিনি ভারতের বিভিন্ন অঞ্চলে ভ্রমণ করে সমাজ, জনজীবন ও রাজনীতি সম্পর্কে প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা অর্জন করেন। তাঁর পর তাঁর শিক্ষা, অভিজ্ঞতা ও রাজনৈতিক চিন্তাধারা নিয়ে আমেদাবাদে সবরমতী নদীর তীরে গড়ে তুললেন একটি আশ্রম। শুরু করলেন, সত্য সাবলম্বী, গ্রাম উন্নয়ন ও অহিংসার বাস্তব প্রয়োগ সম্পর্কে শিক্ষাদান।

<u>আঞ্চলিক ক্ষেত্র : চম্পারণ</u>

প্রথম পর্বের কাজের মধ্য থেকেই শুরু হয়ে গেল গান্ধির দ্বিতীয় পর্বের সূচনা। তিনি

ইংরেজদের ন্যায় বিচার, সমুন্নত সভ্যতা ও সংস্কৃতির প্রতি তখন বিশেষ শ্রদ্ধাশীল ছিলেন এবং ইংল্যান্ডের সঙ্গে ভারতের যোগাযোগকে তিনি ভারতের পক্ষে মঙ্গলকর বলে মনে করতেন। গান্ধি যুদ্ধকালীন দায়িত্বশীল সরকারকে বিনা শর্তে বিবিধ সাহায্যের পুরস্কার স্বরূপ 'কাইহার-ই-হিন্দ' স্বর্ণপদক লাভ করেন। তখনও তিনি সর্বভারতীয় ক্ষেত্রে আবির্ভূত হয়নি। ভারতীয়দের আশা ছিল যে, এই সাহায্যের বিনিময়ে যুদ্ধের পর ব্রিটিশ সরকার ভারতবাসীকে স্বায়ত্তশাসনের অধিকার দিবেন। কিন্তু শেষ পর্যন্ত ১৯১৯ খ্রিষ্টাব্দে মন্টফোর্ড শাসন-সংস্কার আইন পাশ হলে কংগ্রেস নেতারা হতাশা বোধ করেন। দেশের অন্যান্য নেতৃমন্ডলী যখন শাসন-সংস্কার সম্পর্কিত বিতর্কে মগ্ন, তখন গান্ধিজি আঞ্চলিক সংগ্রামে অবতীর্ণ হন। এক্ষেত্রেও তাঁর রাজনৈতিক দর্শন সেই সত্যাগ্রহ। তিনি উপলব্ধি করেছিলেন যে কংগ্রেস নেতৃত্ব তাঁর এই সত্যাগ্রহ দর্শনকে সহজেই মেনে নেবে না। তাই তিনি আঞ্চলিক ক্ষেত্রে এই নীতি প্রয়োগ উদ্যোগী হলেন। গান্ধির ভাবনায় ছিল সত্যাগ্রহ নীতি যদি এই আঞ্চলিক পর্যায়ে সাফল্য লাভ করে তাহলে তিনি সহজেই জনসমর্থন লাভে সক্ষম হবেন। এক্ষেত্রে, তিনটি স্থানীয় সত্যাগ্রহ আন্দোলন তাঁর রাজনৈতিক জীবনের পুনর্বিন্যাস ঘটায়। এই তিনটি স্থানীয় আন্দোলনের প্রথমেই উল্লেখ করতে হয় চম্পরণের কথা। বিহারের এই জেলার নীল চাষিদের দুর্দশা চরমে উঠেছিল। ১৮১৩ খ্রি: চম্পারণে প্রথম নীল চাষের কারখানা গড়ে ওঠে। নীলের চাহিদা বাড়ায় উনবিংশ শতকের মধ্যভাগ থেকে এই ব্যবসাটি লাভজনক হয়ে উঠলে জেলার প্রায় অর্ধেকাংশ ইউরোপীয় ঠিকাদারদের দখলে চলে আসে। ১৮১৬-১৮ খ্রিষ্টাব্দের মধ্যবর্তী সময়ে খাদ্যশস্যের দাম কমে যাওয়ায় চম্পারণের কৃষকেরা তীব্র অর্থনৈতিক সংকটের সম্মুখীন হয়। এরপর চম্পারণ এলাকায় গড়ে ওঠে একটি নতুন প্রথা (১৮৬০ খ্রিষ্টাব্দ থেকে) প্রতি বিঘা জমির তিন কাঠা নীল চাষ করতে চাষিরা বাধ্য থাকত, এই ব্যবস্থাকে বলা হত 'তিনকাঠিয়া'। এই তিনকাঠিয়া ব্যবস্থা ছিল কৃষক স্বার্থের পরিপন্থী। এই ব্যবস্থায় নীল চাষিরা উৎপন্ন নীল নির্দিষ্ট দামে নীলকরদের কাছে বিক্রি করতে বাধ্য থাকত। এছাড়া, তাদের উপর আরো নানা ধরনের অত্যাচার চলত। উনিশ শতকের শেষদিকে কৃত্রিম জার্মান নীল বাজারে এলে নীল চাষ অপ্রয়োজনীয় হয়ে পড়ে এবং চম্পারণের নীলকর সাহেবরা নিজ স্বার্থে নীল চাষিদের অব্যাহতি দিতে থাকে। কৃষকদের মুক্তির বিনিময়ে তাদের উপর নানা অন্যায় করবার আরোপ ও জুলুম চলতে থাকে। চম্পারণের কিছু মানুষের আবেদনে গান্ধিজি এব্যাপারে সক্রিয় হতে বাধ্য হন। এপ্রিল মাসে (১৯১৭) চম্পারণে পৌছনোর পর গান্ধিজি কৃষক ও জোতদার সকলের সঙ্গে কথা বলে বিষয়টি বোঝবার চেষ্টা করেন। চম্পারণের সাধারণ মানুষের কাছে গান্ধিজির সহজ সরল জীবনযাত্রা, অনাড়ম্বর পোশাক এবং সকলের সঙ্গে মিশতে পারার ক্ষমতা তাকে বাপুজিতে পরিণত করে। তাঁকে চম্পারণ ত্যাগের নির্দেশ দেওয়া হলে তিনি মাথা পেতে শাস্তিস্বরূপ বন্দী হন। কিন্তু শেষ পর্যন্ত সরকার তাকে মুক্তি দিতে বাধ্য হয় এবং নীলচাষিদের অবস্থা সম্পর্কে অনুসন্ধানে তদন্ত কমিটি নিয়োগ করা হয়। ফলস্বরূপ 'চম্পারণ কৃষি বিল' পাশের মধ্য দিয়ে চম্পারণে শতবর্ষব্যাপী অত্যাচারের অবসান ঘটে। চম্পারণেই প্রথম অহিংস সত্যাগ্রহ আন্দোলনের সূচনা হয়েছিল যা ভারতের রাজনীতিতে গান্ধিজিকে সুপ্রতিষ্ঠিত করতে সাহায্য করেছিল।

আমেদাবাদ

দ্বিতীয় আঞ্চলিক ক্ষেত্রটি হল আমেদাবাদ। প্লেসকে কেন্দ্র করে আমেদাবাদের শ্রমিকরা দীর্ঘদিন ধরে 'প্লেন বোনাস' পেয়ে আসছিল। কিন্তু তা বন্ধ হয়ে যায়। শ্রমিকরা তাই চাইছিল পঞ্চাশ শতাংশ মজুরী বৃদ্ধি করা হোক। গান্ধিজি তাদের অহিংস ধর্মঘটের পরামর্শ দেন এবং তাদের দাবির সমর্থনে তিনি নিজে অনশন শুরু করেন। আন্দোলনের ব্যাপকতায় মিল কর্তৃপক্ষ ভীত হয়ে আন্দোলনের চতুর্থ দিনে শ্রমিকদের বেতন শতকরা ৩৫ ভাগ বৃদ্ধি করতে বাধ্য হয়। গান্ধিজি অবশ্য মালিকদের ক্ষতি করে শ্রমিকদের অন্যায় আবদারকে যেমন সমর্থন করেননি, তেমনি শ্রমিকদের স্বার্থের দিকে তিনি বিশেষভাবে নজর দিয়েছিলেন। আমেদাবাদেই এই প্রথম

টিপ্পনী

তিনি অনশনকে দাবি আদায়ের হাতিয়ারে পরিণত করেন।

খেদা:

এরপর তিনি গুজরাটের খেদা (কৌরা) জেলার কৃষক আন্দোলনে অংশগ্রহণ করেন। গুজরাটের এই অঞ্চলটিতে বসবাস করত ছোট ছোট জোতদার ও পাটিদার কৃষকরা যাদের সামাজিক ক্ষমতা ছিল ব্রাহ্মণ ও ক্ষত্রিয়দের থেকে অনেক বেশী। ১৮৯৯ খ্রিষ্টাব্দের পর থেকে দুর্ভিক্ষ ও প্লেগের মতো মড়ক রোগে বারবার আক্রান্ত হওয়ায় এই অঞ্চলের মানুষদের দু:খ-দুর্দশা চরমে ওঠে। ১৯১৭ খ্রিষ্টাব্দে অতি বর্ষণে খাদ্য শস্যের উৎপাদন ব্যাহত ঘটলে খাদ্যাভাবকে বিশ্বযুদ্ধজনিত কারণ আরো তীব্র করে তোলে। বল্লভ ভাই প্যাটেল, ইন্দুলাল যাজ্ঞিক প্রমুখ তরুণদের সঙ্গে নিয়ে গান্দিজি যেখানে সত্যাগ্রহ শুরু করেন শেষ পর্যন্ত সরকার নতি স্বীকারে বাধ্য হয়। ইতিমধ্যে সরকার ঘোষণা করে যে, যারা খাজনা দিতে সক্ষম কেবল তাদের কাছ থেকেই খাজনা আদায় করা হবে। ড. রমেশচন্দ্র মজুমদারের মতে, খেদা আন্দোলন একটি আঞ্চলিক আন্দোলন হলেও, এই আন্দোলন ভারতীয় স্বাধীনতা সংগ্রামের চরিত্রে রূপান্তর ঘটায়- শান্ত নিরীহ গ্রামবাসীরা আত্মবিশ্বাসে উদ্বুদ্ধ হয়ে সত্যাগ্রহ ও গণআন্দোলনের পথ ধরে। জুডিথ ব্রাউন মনে করেন, চম্পারণের সত্যাগ্রহে গান্ধিজি বিশেষ গোষ্ঠীর সঙ্গে সংশ্লিষ্ট ছিলেন না। কিন্তু খেদা সত্যাগ্রহ তাঁকে রাজনীতিবিদ হিসাবে প্রতিষ্ঠিত করে।

টিপ্পনী

আঞ্চলিক ক্ষেত্রগুলির মূল্যায়ন:

চম্পারণ, খেদা ও আমেদাবাদের সত্যাগ্রহ জাতীয়তাবাদীদের গন্ডি ছাড়িয়ে সাধারণ মানুষের দৃষ্টি আর্ক,ণ করে। ড. বিপান চন্দ্র বলেন যে, এই আন্দোলনগুলি গান্ধিজিকে ভারতের দীন দরিদ্র জনতার ঘনিষ্ঠ সংস্পর্শে নিয়ে আসে, যাদের দু:খ লাঘবের জন্য তিনি সমগ্র জীবন উৎসর্গ করেছিলেন। সমাজে সাধারণ মানুষের কাছে সৃষ্টি হয় গান্ধি নামের মিথ (Myth)। চম্পারণে সরকারি তদন্ত কমিটির সামনে সাক্ষ্য দিতে গিয়ে জনৈক কৃষক বলেন-'' গান্ধি হচ্ছেন রাম। গান্ধি আমাদের মধ্যে আছেন, তাই আমরা আর নীলকর রাক্ষসদের ভয় পাই না।'' বস্তুত, গান্ধির আগমনের পূর্ব পর্যন্ত জাতীয় আন্দোলন শহরের মধ্যবিত্ত ও বুদ্ধিজীবিদের মধ্যেই সীমাবদ্ধ ছিল। কিন্তু গান্ধির আগমনে সেই সীমাবদ্ধতা আর থাকল না; জায়গা পেল নিরক্ষর কৃষক থেকে শুরু করে শহুরে মজুর সহ একেবারেই সাধারণ মানুষ।

রাওলাট সত্যাগ্রহ ও পাঞ্জাব সন্ত্রাস :

একদিকে মন্টেগু চেমস্‌ফোর্ড শাসন সংস্কার আইন অপরদিকে কুখ্যাত 'রাওলাট আইন' প্রবর্তন- শোষণ ও দমন নীতি কারো পক্ষে খুব একটা ভালো ঠেকেনি। প্রথম বিশ্বযুদ্ধ চলাকালেই ভারতের রাজদ্রোহীতা ও বৈপ্লবিক কার্যকলাপের প্রকৃতি নির্ণয় করা এবং বৈপ্লবিক আন্দোলন দমনের জন্য প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা সম্বন্ধে সুপারিশ করা- এই দুই কাজের জন্য ভারত সরকার ১৯১৭ খ্রিষ্টাব্দের ডিসেম্বরে একটি কমিটি গঠন করেন। এই কমিটি 'সিডিশন কমিটি' নামে পরিচিত। ইংল্যান্ডের বিচারপতি স্যার সিডনি রাওলাট ছিলেন এই কমিটির সভাপতি। এই কমিটির সুপারিশ আইনরূপে গৃহীত হলে দেখা যায় রুদ্ধদ্বার আদালতে বিনা উকিলের সাহায্যে সন্দেহভাজন ব্যক্তিকে বিচার করে আভ্যন্তরীণ বা বিনা বিচারে আটকে রাখা হচ্ছে। এতো কঠোর আইন প্রনয়ণের একটা সম্ভাব্য কারণ হল মন্টেগুর প্রস্তাবে ভারতের স্বায়ত্তশাসন সম্পর্কে উদারনৈতিক সংস্কার। ভারতীয় দৃষ্টিকোণ থেকে রাওলাট আইন ছিল পুলিশকে খুদে উৎপীড়কে পরিণত করার এক সফল প্রচেষ্টা মাত্র। প্রতিবাদ এসেছিল প্যাটেল থেকে মালব্য, সাপ্রু থেকে নায়ারের মতো আইন সভার প্রতিনিধিদের কাছ থেকেও। বিভিন্ন মতপার্থক্য থাকলেও ভারতীয়

নেতৃবর্গ রাওলাট আইনের বিরুদ্ধে তীব্র জানালেও একমাত্র গান্ধি সর্বভারতীয় পর্যায়ে গণপ্রতিবাদের পরামর্শ দেন। তিনি বলেন–'' এই সেদিন পর্যন্ত ভারতবাসী খোলা মনে ইংরেজকে যুদ্ধজয়ে সাহায্য করার পর, তাদের বিরুদ্ধে এরূপ দমনমূলক আইন পাশ করা লজ্জাজনক ঘটনা।'' ঐতিহাসিক তারাচাঁদের মতে, 'গান্ধিজির মতো এক মহান সত্যের পূজারীর এই মানসিক পরিবর্তন ভারতে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের নৈতিক ভিত্তির ধ্বংস সুনিশ্চিত করে।' গান্ধিজি প্রথমে একটি 'সত্যাগ্রহ সভা' গঠন করলেন। এরপর তিনি নিজের তৈরী একটি শপথ নামায় স্বাক্ষর করলেন এবং অন্যান্য সত্যাগ্রহীদের তাতে স্বাক্ষর করতে বললেন। শপথনামায় স্বাক্ষরকারীরা আইন অমান্যের মধ্য দিয়ে কারা-বরণ করবে এই ছিল পরিকল্পনা। রবীন্দ্রকুমার দেখিয়েছেন যে, রাওলাট সত্যাগ্রহের কারণ ছিল নৈতিক, অর্থনৈতিক নয়। ১৯১৯ খিস্টাব্দে এপ্রিল মাসের ৬ তারিখ দেশব্যাপী সাধারণ ধর্মঘটের ডাক দেওয়া হয়। প্রথম থেকেই আন্দোলনের মধ্যে একটি খাপছাড়া ভাব দেখা দিয়েছিল। নগরকেন্দ্রিক রাওলাট আন্দোলনে মধ্যবিত্ত ও কারিগর শ্রেণী সক্রিয় ভূমিকা গ্রহণ করেছিল। তবে এই সত্যাগ্রহ দ্বারা সবচেয়ে বেশি প্রভাবিত হয়েছিল পাঞ্জাব। রবীন্দ্র কুমার সম্পাদিত Essays On Gandhian Polities : The Rowlatt Satyagraha of 1919 গ্রন্থে আঞ্চলিক পর্যায়ের এই আন্দোলনের নানা তথ্য উপস্থাপিত হয়েছে। মূলত নির্মমভাবে সৈন্য সংগ্রহ ও যুদ্ধকালীন দাবি আদায়ের জন্য ১৯১৫ খ্রিস্টাব্দে গদর পার্টির উত্থান পাঞ্জাবে এক ভিন্ন পরিস্থিতির সৃষ্টি করে। লাহোর নিয়ে রবীন্দ্র কুমারের গবেষণায় আন্দোলনের অর্থনৈতিক কারণ বিশেষভাবে উঠে এসেছে। 'কোমাগাতামারু' জাহাজে শিখদের উপর গুলি চালানোর ঘটনাও জনমানসে এক বিরূপ প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি করে। ইতিমধ্যে হিন্দু-মুসলিম মিলিতভাবে বিভিন্ন শহরে গঠন করেছিল 'গণকমিটি'। পাঞ্জাবে হিন্দু-মুসলিম ঐক্য দেখে সরকার ভয় পেয়ে যান এবং রাওলাট আইনের সাহায্যে প্রচন্ড দমন পীড়ন চালান। এরই প্রতিবাদে অমৃতসরের নেতা কিচলু ও সত্যপাল গ্রেপ্তার হন। গান্ধিজিকে দিল্লী ও পাঞ্জাবে প্রবেশে নিষেধাজ্ঞা দেওয়া হয়। ১৩ এপ্রিল ভারতবর্ষের ইতিহাসে এক চরম দু:খময় দিন। অমৃতসরের জালিয়ানওয়ালাবাগে এক বিশাল সমাবেশে বিনা প্ররোচনায় সামরিক অধিকর্তা জেনারেল ডায়ার গুলি চালনার নির্দেশ দেন। ফলে, প্রায় সহস্রাধিক নিরীহ মানুষ সেদিন নিহত হয়েছিল জেনারেল ডায়ারের অমানবিক নির্দেশে। আরো পরিতাপের বিষয়, ঐ দিন 'সান্ধ্য আইন' জারি করে আহতদের মুখে জল দেবার জন্যও কাউকে ঘরের বাইরে আসতে দেওয়া হয়নি। একই সঙ্গে পাঞ্জাবের অন্যান্য স্থানে চলেছিল নির্মম অত্যাচার। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ব্রিটিশের দেওয়া 'নাইট' উপাধি ত্যাগ করেন।

সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের মতে, ''জালিয়ানওয়ালাবাগের ভয়াবহ ঘটনা সমগ্র ভারতে এক মহাযুদ্ধের আগুন প্রজ্জ্বলিত করে এবং তা উত্তর, দক্ষিণ, পূর্ব ও পশ্চিমে পরিব্যপ্ত হয়ে সবার হৃদয়ে ক্রোধের সঞ্চার করে।'' গান্ধিজি তাঁর 'ইয়ং ইন্ডিয়া' পত্রিকায় লেখেন-''এই শয়তান সরকারের সংশোধন অসম্ভব। একে ধ্বংস করতেই হবে।'' ভারতবাসী ঔপনিবেশিক শাসনের বিরুদ্ধে কতখানি সোচ্চার হতে পারে তার প্রমাণ যেমন রাওলাট সত্যাগ্রহে পাওয়া গিয়েছিল তেমনি পাঞ্জাবের হত্যাকান্ড প্রমাণ করে দেয় যে ঔপনিবেশিক শাসকরা নিষ্ঠুরতার কোন স্তর পর্যন্ত যেতে পারে। এখান থেকে জাতীয়তাবাদী নেতৃবর্গ এই শিক্ষা গ্রহণ করে যে, ঔপনিবেশিক শাসকদের সঙ্গে আর কোন ধরনের আপস সম্ভব নয়।

<u>খিলাফৎ আন্দোলন</u> :

ভারতীয় স্বাধীনতা সংগ্রামের ইতিহাসে খিলাফৎ আন্দোলন এক গুরুত্বপূর্ণ অধ্যায় হিসেবে চিহ্নিত। কারণ ইংরেজরা কখনই চায়নি হিন্দু-মুসলিম ঐক্য সাধিত হোক। হিন্দু-মুসলিম ঐক্যসাধনে তারা সর্বদাই ভীত-সন্ত্রস্ত ও চিন্তিত হয়ে পড়েছিল। প্রথম বিশ্বযুদ্ধে তুরস্ক মিত্রশক্তির বিরুদ্ধে জার্মানির পক্ষে যোগদান করে। ফলস্বরূপ ভারতীয় মুসলমান সমাজকে এক অস্বস্তিকর

টিপ্পনী

পরিস্থিতির সম্মুখীন হতে হয়। তুরস্কের সুলতান ছিল মুসলিম জগতের ধর্মগুরু। তাই যুদ্ধান্তে মিত্রপক্ষ তুরস্ক সাম্রাজ্যের ব্যবচ্ছেদ এবং সুলতানের মর্যাদা খর্ব করার চেষ্টা করলে ভারতীয় মুসলিম সমাজে ব্যাপক ক্ষোভর সঞ্চার হয়। ''খলিফাকে তার হৃত মর্যাদায় পুন:প্রতিষ্ঠিত করার উদ্দেশ্যে ভারতীয় মুসলমানরা যে আন্দোলন শুরু করে তা খিলাফৎ আন্দোলন নামে খ্যাত। ফজলুল হকের সভাপতিত্বে সর্বভারতীয় খিলাফৎ সম্মেলনে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয় বয়কট ও অসহযোগের। খিলাফতিদের মূল দাবি ছিল খলিফার সাম্রাজ্য অটুট রাখতে হবে; আরব, সিরিয়া, প্যালেস্টাইন ও মেসোপটেমিয়ার উপর তার আধিপত্যকে অক্ষুন্ন রাখতে হবে এবং মুসলিমদের পবিত্র স্থান মক্কা ও মদিনার উপর কোনো বিদেশী হস্তক্ষেপ চলবে না। গান্ধিজি এক বিশেষ অধিবেশনে খিলাফৎ আন্দোলনকারীদের এই দাবীকে বিশেষভাবে সমর্থন জানান। গান্ধি মনে করেন যে, খিলাফৎ সমস্যা- হিন্দু-মুসলিম ঐক্যের সুযোগ এনে দিয়েছে। তাই খিলাফৎ সমস্যাকে কেন্দ্র করে হিন্দু-মুসলমান ঐক্য গড়ে তুলে একটি দলবদ্ধ আন্দোলন তিনি পরিচালনা করতে চাইছিলেন। এই অবস্থায় গান্ধিজি পাঞ্জাব ও খিলাফৎ 'অন্যায়' দুটিকে একসূত্রে গ্রথিত করে অসহযোগ আন্দোলনের ডাক দেন। জুডিথ ব্রাউন মনে করেন, এই দুটি আন্দোলনকে একটি সূত্রে না বাঁধলে হিন্দু সম্প্রদায় অসহযোগ আন্দোলনে অবতীর্ণ হত কিনা সে বিষয়ে সন্দেহ থেকে যায়। Judith M.Brown-Gandhiss Rise to Power, PP 204-207.

টিপ্পনী

<u>অসহযোগ আন্দোলন</u> :

কংগ্রেসের কর্মপন্থা স্থির করার জন্য ১৯২০ খ্রি: সেপ্টেম্বর মাসে কলকাতায় এক বিশেষ অধিবেশন বসে। গান্ধিজি এই কংগ্রেসের দাবি আদায়ের জন্য বয়কট বা অসহযোগের প্রস্তাব দেন। কংগ্রেস আন্দোলনের লক্ষ্য হিসাবে 'স্বরাজ দাবি' গৃহীত হয়। যে তিনটি লক্ষ্য কংগ্রেস সামনে রেখেছিল সেগুলি হল-

(১) পাঞ্জাব অন্যায়ের প্রতিকাব, (২) খিলাফৎ সমস্যার সমাধান ও (৩) এক বছরের মধ্যে স্বরাজ আনার প্রতিশ্রুতি।

স্বরাজ আনার প্রতিশ্রুতি চরমপন্থী নেতৃবর্গকে বিশেষভাবে আকৃষ্ট করেছিল; অন্যদিকে বোম্বাই সহ কয়েকটি প্রদেশের অধিকাংশ প্রতিনিধিরা তাতে সমর্থন জানান। কলকাতা অধিবেশনের প্রস্তাবটি নাগপুরের বার্ষিক সম্মেলনে উপস্থাপিত হয় চূড়ান্ত অনুমোদনের জন্য। নাগপুরের জাতীয় অধিবেশন যে তিনটি প্রশ্নকে ঘিরে আবর্তিত হয়েছিল, তা হল-কংগ্রেসের লক্ষ্য কী হবে, কী কার্যক্রম গ্রহণ করা হবে, সাংগঠনিক পর্যায়ে কী পরিবর্তন আনা হবে। আসলে নাগপুরের অধিবেশন ছিল দাসপন্থী (চিত্তরঞ্জন) ও গান্ধিপন্থীদের মধ্যে চূড়ান্ত শক্তি-পরীক্ষা। দাসপন্থীরা বয়কট প্রস্তাব গ্রহণ না করে আইন সভায় যোগ দিয়ে সরকারকে বিব্রত করার কর্মসূচী তুলে ধরেন। অমলেশ ত্রিপাঠীর মতে, চিত্তরঞ্জনের বিশ্বাস ছিল যে, বয়কটের দ্বারা ইংরেজকে জব্দ করা যাবে না। তাছাড়া দেশবাসী অহিংস অসহযোগের জন্য প্রস্তুত নয়। এজন্য তৈরী হতে দীর্ঘ সময় লাগবে।

যাই হোক, নাগপুর কংগ্রেসে দাসপন্থী ও গান্ধিপন্থীদের মধ্যে চূড়ান্ত শক্তি পরীক্ষায় গান্ধি জয়লাভ করেন। নাগপুর কংগ্রেসের অধিবেশনের সিদ্ধান্তের পর অসহযোগ আন্দোলন সর্বভারতীয় রূপ পরিগ্রহ করে। ভারতের রাজনীতিতে যেমন গান্ধিজির পূর্ণ আধিপত্য প্রতিষ্ঠিত হয় তেমনি কংগ্রেস কর্মসূচীতেও আসে রূপান্তর। গ্রাম, জেলা, প্রদেশ এর সঙ্গে কংগ্রেস কমিটি একত্রিত হয়ে গান্ধির নেতৃত্বে ওয়ার্কিং কমিটি একটি শক্তিশালী অস্ত্রে পরিনত হয়। এখই সঙ্গে দেখা যায় বিভিন্ন স্তরের মানুষ বয়কটে অংশগ্রহণ করে। বারাণসীর অধিবেশনে স্বরাজ দাবি আদায়ের জন্য আন্দোলনের চূড়ান্ত কার্যক্রম ঘোষিত হয়। স্কুল, কলেজ, আদালত বয়কট এবং

আন্দোলনের ব্যয় স্বরূপ তিলক স্বরাজ ভান্ডারে এক কোটি টাকা তোলার কথা ঘোষণা করা হয় এবং সবকিছুই সম্পন্ন হবে পূর্ণ অহিংসার পথে। গান্ধিজির ডাকে সারা ভারতে যে আবেগের বন্যা বয়ে গিয়েছিল তার পিছনে ছিল সাধারণ মানুষের কাছে 'ন্যায় রাজ্য' আবির্ভাবের আশা। বাংলা, দক্ষিণ ভারত, বিহার, পাঞ্জাব, মধ্যপ্রদেশ ও অন্যান্য স্থানেও এই আন্দোলন জোরদারভাবেই ছড়িয়ে পড়েছিল।

অসহযোগ কর্মসূচীর সফলতা বা বিফলতার মধ্যে যা পাওয়া যায় তা হল-এর প্রধান দুটি দিক আছে। একটি গঠনমূলক এবং অন্যটি ধ্বংসাত্মক। নেতিবাচক কর্মসূচীর মধ্যে ছিল-সরকারি চাকরী, অনুষ্ঠান, খেতাব, স্কুল-কলেজ, আইনসভা, আদালত ও বিদেশী পণ্য বর্জন। অপরদিকে গঠনমূলকের মধ্যে ছিল দেশীয় শিক্ষা প্রতিষ্ঠান স্থাপন, শিল্পের প্রসার, সালিশী বোর্ড গঠন, চরকা ও খদ্দরের ব্যাপক প্রচলন, হিন্দু-মুসলিম ঐক্য প্রতিষ্ঠা, মাদক বর্জন ও অসস্পৃশ্যতা পরিহার প্রভৃতি। রমেশচন্দ্র মজুমদারের মতে, " অসহযোগ আন্দোলন সম্পূর্ণভাবে সফল না ব্যর্থ হয়েছে তা বলা যায় না। এই দুইয়ের মধ্যেসত্য নিহিত আছে।" আর স্বরাজ সম্পর্কে গান্ধির অভিব্যক্তি-ভারতীয় মূলধনই আমেরিকার রফফেলারের থেকে ভালো একথা তিনি মনে করেন না। ওঁনার মতে ইংরেজ চলে গেলে দেশের কিছু লোক ইংরেজদের মতই শাসন চালালে প্রকৃত স্বরাজ আসবে না। দেশের সকল শ্রেণীর সামাজিক ও অর্থনৈতিক যুক্তিই হল স্বরাজের অন্যতম লক্ষ্য। 'আত্মন্নোতি ও আত্মশক্তি গঠন স্বরাজের আদর্শ।'

টিপ্পনী

আইন অমান্য আন্দোলন, গোলটেবিল ও গান্ধি-আরউইন চুক্তি :

অসহযোগ আন্দোলনের পর আইন অমান্য আন্দোলন ঔপনিবেশিক সরকারকে উদ্‌বিগ্ন করে তুলেছিল। সরকার আন্দোলন ভাঙ্গার জন্য সব রকমের অস্ত্র প্রয়োগ করেছিল; কিন্তু আন্দোলনের তীব্রতা কমাতে পারেনি। দেখা গেছে উত্তরোত্তর বিপ্লবীদের কর্মকান্ড সরকারকে আরো বেশি বিব্রত করে তুলেছিল। ইতিপূর্বে সাইমন কমিশন (হুইট) শাসন ক্ষমতায় ভারতীয়দের অযোগ্যতার যে নজির দেখিয়েছে তাও কিন্তু নেহরু রিপোর্ট যথাযথ নস্যাৎ করে দেখিয়েছিল ভারতীয়রাও কোন অংশে কম নয়। আর আইন অমান্য আন্দোলনে সর্বসাধারণের যে ইচ্ছাকে সামনে রাখা হয়েছিল-তাতে সকল ভারতবাসীরই মনে রেখাপাত করেছিল। কিন্তু পরিতাপের বিষয় গান্ধিজির দাবিগুলি সরকারের মনে কোন রেখাপাত করেনি। ১৯৩০ খ্রিষ্টাব্দের ১২ মার্চ গান্ধির নেতৃত্বে আটাত্তর জন সহযোগী আনুষ্ঠানিকভাবে আইন অমান্য করতে ডান্ডি অভিমুখে যাত্রা করেন। তখনও পর্যন্ত সমর্থক এবং বিরোধীরা উভয়েই আশা করেছিলেন যে লবণ আইন ভঙ্গ বিশেষ সাফল্য লাভ করতে পারবে না কিন্তু এপ্রিলের ৫ তারিখ (১৯৩০) ডান্ডিতে লবণ আইন ভঙ্গ করার দিন সকলের সংশয়কে মিথ্যা প্রমাণিত করে গান্ধিজির আইন অমান্য আন্দোলন সমগ্র দেশে উদ্দীপনার সঞ্চার করে। লবণ আইন ভঙ্গের সঙ্গে যুক্ত হয় হরতাল, পিকেটিং ও মাদকদ্রব্য বর্জন।

ভারতবর্ষের বিভিন্ন প্রান্তে যখন আইন অমান্য আন্দোলন তুঙ্গে তখন ঔপনিবেশিক সরকার সন্ত্রস্ত্র ও ভীত হয়ে কূটকৌশলে হিন্দু-মুসলিম বিভেদ নীতির সিদ্ধান্ত নিলেন। একই সঙ্গে পরিস্থিতির কথা মাথায় রেখে সরকার আলোচনার রাস্তাও খোলা রাখলেন। ইতিমধ্যে প্রকাশিত সাইমন কমিশনের রিপোর্ট কোনো রাজনৈতিক দলই গ্রহণ করতে রাজি হল না। এই অবস্থায় কংগ্রেস বিরোধী দলগুলির কাছ থেকে সমর্থনের জন্য আরউইন মরিয়া হয়ে উঠলেন। যদিও প্রথম গোলটেবিল বৈঠকের ব্যবস্থা করে কংগ্রেসকে সেই আলোচনার টেবিলে উপস্থিত করার প্রচেষ্টা অব্যাহত রইল। অন্যদিকে মুসলিম লিগ ও হিন্দু মহাসভার নেতৃত্বকে আলোচনায় উপস্থিত করে সরকার ভেদনীতির পথে হাটতে চাইলেন। কিন্তু কংগ্রেসের অনুপস্থিতিতে প্রথম বৈঠক ব্যর্থতায় পর্যবসিত হয়। ইংরেজ সরকার উপলব্ধি করে কংগ্রেসকে বাদ দিয়ে ভারতবর্ষে

টিপ্পনী

রাজনৈতিক সমস্যার সমাধান কখনও সম্ভব নয়। ইতিমধ্যে ইংল্যান্ডে রাজনৈতিক পরিবর্তন ঘটেছে, সেখানে গঠিত হয়েছে শ্রমিক দল মন্ত্রীসভা। গান্ধির ওপর সমস্ত নিষেধাজ্ঞা প্রত্যাহার করা হয় এবং তাকে আলোচনায় বসার অনুরোধ জানানো হয়। এরূপ প্রেক্ষাপটে গান্ধি-আরউইন চুক্তি সম্পাদিত হয়। পরবর্তীকালে বিভিন্ন বাধা বিপত্তির মধ্য দিয়ে এই চুক্তি অনুমোদিত হয়। জাতীয় কংগ্রেস থেকে দ্বিতীয় গোলটেবিল বৈঠকে যাওয়ার জন্য কেবলমাত্র গান্ধিজির নাম অনুমোদিত হয়। এই গোলটেবিল বৈঠকে মূল আলোচ্য বিষয় ছিল যুক্তরাষ্ট্র ও সংখ্যালঘু প্রশ্ন। গান্ধিজি বিভিন্ন কেন্দ্রে এবং প্রদেশে দায়িত্বশীল সরকার গঠনের দাবি জানান কিন্তু সরকার গান্ধিজির এই দাবিকে মানতে অস্বীকার করে। ১৯৩২ খ্রিস্টাব্দের জানুয়ারী মাসে গান্ধিজি দ্বিতীয় আইন অমান্য আন্দোলনের ডাক দিলেন। নজিরবিহীন যাত্রায় পীড়নমূলক ব্যবস্থার মুখেও কংগ্রেস নেতৃত্ব দেড় বছর ধরে লড়াই চালিয়ে ছিল। তৃতীয় গোলটেবিল বৈঠকের প্রাক্কালে 'বাঁটোয়ারানীতি' ঘোষণা করে সরকার উদ্দেশ্য প্রণোদিতভাবে সংখ্যালঘু প্রশ্ন ও সমগ্র দায়িত্বকে উস্কানি দেয়। জেল থেকে মুক্তিলাভ করে গান্ধিজি সত্যাগ্রহ আন্দোলন প্রত্যাহার করে নেন এবং হরিজন আন্দোলনে আত্মনিবেশ করেন। ইতিপূর্বে, পুনা:চুক্তিতেও গান্ধির ভূমিকা ছিল চোখে পড়ার মতো। আর সাম্প্রদায়িক বাঁটোয়ারা প্রসঙ্গে গান্ধির প্রতিবাদ ছিল-'' তিনি জীবনশুল্ক দিয়ে হিন্দু সম্প্রদায়ের ঐক্য রক্ষা করবেন। যতদিন সাম্প্রদায়িক বাঁটোয়ারা রদ হয়ে হিন্দুদের যৌথ নির্বাচন স্বীকৃত না হয়, ততদিন তাঁর মৃত্যু হলেও তিনি অনশন করবেন। তথাপি, জাতীয় আন্দোলনে গান্ধির ভূমিকা শুধু উপরোক্ত বা ভারত ছাড়ো আন্দোলনের মধ্যে সীমাবদ্ধ ছিল না; আমৃত্যু তাঁর মৃত্যু পর্যন্ত সবকিছুই তাঁর সঙ্গে ওতোপ্রোতভাবে জড়িয়ে ছিল।

প্রশ্নাবলী

১. ভারতবর্ষের ইতিহাসে গান্ধির উত্থানকে আপনি কীভাবে ব্যাখ্যা করবেন?

২. গান্ধির আঞ্চলিক সত্যাগ্রহের মূল্যায়ন করুন।

৩. খিলাফৎ ও অসহযোগ আন্দোলন সম্পর্কে আলোচনা করুন।

৪. আইন অমান্য আন্দোলন কতটা সফল হয়েছিল?

সংক্ষিপ্ত :

১. Unto the last কার রচনা?

২. সত্যাগ্রহ কী?

৩. 'নিস্ক্রিয়' প্রতিরোধ কী?

৪. বুওয়র কারা?

৫. গোপালকৃষ্ণ গোখলে কে ছিলেন?

৬. চম্পারণ কোথায় অবস্থিত?

৭. 'প্লেগ বোনাস' কী?

৮. রাওলাট সত্যাগ্রহ বলতে কী বোঝেন?

৯. কেন 'খাদ্য আইন' জারি করা হয়?

১০. কোন দেশের সুলতান মুসলিম জগতের ধর্মগুরু?

১১. কলকাতা ও নাগপুর অধিবেশনের সময়কাল উল্লেখ করুন।

১২. ডান্ডি অভিযানের সময়কাল উল্লেখ করুন।

১৩. গান্ধি-আরউইন চুক্তি কী?

গ্রন্থপঞ্জী

১. শেখর বন্দ্যোপাধ্যায়, পলাশি থেকে পার্টিশন

২. সুমিত সরকার, আধুনিক ভারত

৩. বিপানচন্দ্র ও অন্যান্য, ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রাম

৪. অমলেশ ত্রিপাঠী-স্বাধীনতা সংগ্রামে ভারতের জাতীয় কংগ্রেস

৫. সমর কুমার মল্লিক,

৬. সূচিব্রত সেন,

৭. শান্তিকুমার মিত্র (সম্পাদিত) গান্ধি রচনা সম্ভার (প্রথম খন্ড)

- কেমব্রিজ বর্গের ঐতিহাসিক – অলিল শীল, গ্যালাহার, জুডিথ ব্রাউন, ব্রুমফিল্ড প্রমুখ।
- নিম্নবর্গের একজন ঐতিহাসিক – রণজিৎ গুহ।
- 'গান্ধিজির যুগ' – ১৯১৯-১০৪৭ খ্রিস্টাব্দ।
- Bore (বুওর) – ১৮৯৩ খ্রিস্টাব্দে অনেক আগেই দক্ষিণ আফ্রিকার ডারবান উপকূল এলাকায় ভিড় জমিয়ে ছিল ইংরেজরা এবং হল্যান্ডের লোকজন।এই সব আমচাষিদের ডাচ ভাষায় বলা হত Bore (বুওর)।
- হিন্দ্ স্বরাজ (১৯০৮ খ্রিস্টাব্দ) – গুজরাটি ভাষায় লিখিত।
- পাশ্চাত্য দার্শনিক – টলস্টয় রস্কিন প্রমুখ।
- যাদুগোপাল মুখোপাধ্যায় – যুগান্তর দলের বিখ্যাত নেতা।(তাঁর আত্মজীবনীতে গান্ধি সম্পর্কে লিখেছেন তিনি নিপীড়িত মানুষের দুঃখ কষ্টে ব্যথিত হয়ে রাজনীতিতে প্রবেশ করেন। তিনি চান মানুষকে উচ্চতর অবস্থার জীবে পরিণত করতে।
- Sub Contractor – গান্ধির নিযুক্ত উপঠিকাদার (জুডিম ব্রাউনের দৃষ্টিতে)।
- ঢোঁড়াই চরিত মানস – সতীনাথ ভাদুড়ীর বিহার এলাকার সাধারণ মানুষের মনে গান্ধিজি নিয়ে যে কল্পকথার জন্ম হয়েছিল তার একটি সুন্দর উদাহরণ পাওয়া যায় সতীনাথ ভাদুড়ীর এই উপন্যাসে।
- ফিনিক্স বিদ্যালয় – দক্ষিণ আফ্রিকায়।
- 'গান্ধীপুন্যাহ দিবস' – ১৯১৫ খ্রিঃ ১০ মার্চ।(এই দিনটিতে শান্তিনিকেতনে 'গান্ধীপুন্যাহ দিবস' পালন শুরু হয়।এই ঐতিহ্য এমনও অব্যাহত।)
- 'তিন কাঠিয়া' – বিঘা প্রতি তিন কাঠা নীলচাষ করতে চাষিরা বাধ্য থাকত, এই

টিপ্পনী

ব্যবস্থাই 'তিনকাঠিয়া'।

- রাজকুমার শুক্লা – চম্পারণের কৃষক পরিবারের সন্তান।
- Champaran Agrarian Act – ১৯১৮ খ্রিস্টাব্দে Champaran Agrarian Enquiry Committee এই আইন পাশ করে। এই আইন অনুসারে 'তিনকাঠিয়া' প্রথার বিলোপসাধন করা হয়।
- Essay on Gandhian Politics : The Rowlatt Satyagraha of 1919 গ্রন্থ – রবীন্দ্র কুমার (সম্পাদিত)।
- Massacre at Amritsar গ্রন্থ – ফারচনা।
- খলিফা – সমস্ত মুসলিম দুনিয়ার ধর্মীয় নেতা। (৬৩২ খ্রিস্টাব্দে নবি হজরত মহম্মদের মৃত্যুর পর মদিনায় হজরত আবু বকরের খলিফা হিসাবে নির্বাচনের মধ্যে দিয়ে খিলাফৎ ভাবনার শুরু।
- Gandhi's Rise to Power : Indian Politics 1915-1922 – জুডিম ব্রাউন।
- সত্যাগ্রহ – সত্যের ভিত্তিতে নিরস্ত্র ও অহিংসভাবে অন্যায়ের বিরুদ্ধে সংগ্রাম। মহাত্মা গান্ধির এই আন্দোলন পদ্ধতি সত্যাগ্রহী নামে পরিচিত।
- গোপাল কৃষ্ণ গোখলে – গান্ধিজির রাজনৈতিক গুরু।
- ১৯১৬ খ্রিস্টাব্দ – সবরমতী আশ্রম প্রতিষ্ঠা, লক্ষ্ণৌ চুক্তি এবং হোমরুল লীম প্রতিষ্ঠা।
- ১৯১৭, ১৯১৮ এবং ১৯১৯ খ্রিস্টাব্দ – প্রথমটিতে চম্পারণ দ্বিতীয়টিতে আমেদাবাদ ও খেদা বা খেড়া সত্যাগ্রহ এবং তৃতীয়টি মন্টেড চেমসফোর্ড সংস্কার আইন, রাউলাট আইন, জালিয়ানবাগ হত্যাকান্ড ও খিলাফৎ আন্দোলন।
- ১৯২০ খ্রিস্টাব্দ – গান্ধিজি 'কাইজার-ই-হিন্দ' উপাধি ব্রিটিশ সরকারকে প্রত্যার্পণ করেন, ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেসের কলকাতা অধিবেশন।
- ১৯২২ খ্রিস্টাব্দ – চৌরীচৌরা ঘটনা।
- ১৯২৩ খ্রিস্টাব্দ – বেঙ্গল প্যাক্ট।
- ১৯২৭ খ্রিস্টাব্দ – সাইমন কমিশন।
- ১৯২৮ খ্রিস্টাব্দ – নেহেরু রিপোর্ট।
- ১৯২৯ খ্রিস্টাব্দ – পূর্ণ স্বরাজ বা পূর্ণ স্বাধীনতার দাবি গৃহিত। খুদা-এ-সি মত নগর দল প্রতিষ্ঠা ও চোদ্দ দফা শর্ত।
- ১৯৩০ খ্রিস্টাব্দ – আইন-অমান্য আন্দোলনের সূত্রপাত।
- ১৯৩২ খ্রিস্টাব্দ – সাম্প্রদায়িক বাঁটোয়ারা, পুণা চুক্তি ও লাহোর ষড়যন্ত্র মামলা।
- ১৯৩৫ খ্রিস্টাব্দ – 'গভর্ণমেন্ট অফ ইন্ডিয়া অ্যাক্ট' প্রণয়ন।
- ১৯৩৭ খ্রিস্টাব্দ – জাতীয় প্ল্যানিং কমিটির গঠন।
- ১৯৪১ খ্রিস্টাব্দ – 'জনযুদ্ধ তত্ত্ব'।

- ১৯৪৫ খ্রিস্টাব্দ – ওয়াকেল পরিকল্পনা, আজাদহিন্দ সপ্তাহ পালন।
- ১৯৪৬ খ্রিস্টাব্দ – মন্ত্রি মিশনের আক্রমণ, প্রত্যক্ষ সংগ্রাম পালন, গ্রেট ক্যালকাটা কিলিং, প্রাদেশিক সরকার গঠন ও গণপরিষদের গঠন।
- ১৯৪৮ খ্রিস্টাব্দ – গান্ধির শেষ অনশন ও তাঁর হত্যাকান্ড।

টিপ্পনী

টিপ্পনী

টিপ্পনী

টিপ্পনী